মধ্যযুগের ইতিকথা

Recommended by the W. B. Board of Secondary Education
as a History Text Book for class VII.
Vide P. T. B. No. VII/H/81/129 dated 4. 2. 81.

মধ্যযুগের ইতিকথা

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীসুশান্ত কুমার চক্রবর্তী এম্, এ, বি,টি,
ইতিহাস শিক্ষক, কুমুদ কুমারী হায়ার সেকেণ্ডারী
বিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম।
প্রাক্তন ইতিহাস শিক্ষক, বিষ্ণুপুর এবং এথোরা
হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়।
"ভারতের ইতিহাস" অষ্টম শ্রেণী গ্রন্থের প্রণেতা।

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন• কলিকাতা-৯

সংস্করণ—১৯৮৪

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস,
ভোলানাথ প্রকাশনী,
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

(ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত)

মূল্য-৮·৫০

মুদ্রাকর :
প্রতিমা প্রিন্টকো,
১৮/এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পাঠ

মধ্যযুগ

মধ্যযুগ কাকে বলে : মানবজাতির ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করে থাকি ; প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও বর্তমান বা আধুনিক যুগ। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিহাসে একটা যুগের আরম্ভ হয়। ৪৭৬ খৃস্টাব্দে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয়। মোটামুটি ভাবে বলা চলে প্রাচীন যুগের শেষ ও বর্তমান যুগের আরম্ভ এই দুয়ের মাঝামাঝি সময়টাই মধ্যযুগ অর্থাৎ ৪৭৬ খৃস্টাব্দে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য বা কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত সময়টাই মধ্যযুগ।

তবে মনে রাখা দরকার, ইতিহাসে এই যুগ বিন্যাসে খুব একটা কড়াকড়ি নাই। কারণ অনেক বিষয়েই প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে মধ্যযুগে মিশে গেছে। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগ ঠিক একই সময়ে আরম্ভ হয়নি বা একই সময়ে শেষও হয়নি। দেখা যাচ্ছে প্রায় হাজার বছর ধরে মধ্যযুগ চলেছিল। পূর্বে ভারত ও চীন, ইউরোপে গ্রীস ও রোম, মধ্যপ্রাচ্যে সুমেরিয়া, ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও ইরাণ এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিশর ছিল প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র। এদের কাছে এসেই অনেক জাতি উন্নতি করতে শিখেছিল। সেই উন্নতি একদিনে হয়নি। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে হয়েছে। অনেক সময়ও নিয়েছে। প্রাচীন যুগের পর এই উন্নতির সময়কেই বলা চলে মধ্যযুগ।

ইউরোপে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য : যখন রোম সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরেছে ঠিক সেই সময় বিভিন্ন বর্বর জাতি রোম আক্রমণ করে ধ্বংস করে। ফলে রোমের অধীনে ইউরোপে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙ্গে পড়ে। বর্বরেরা ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়

নিজেদের আলাদা আলাদা রাজ্য গঠন করে। এইভাবে এক নতুন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে বর্বরেরা নিজেদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি মিশিয়ে ইউরোপে এক মিশ্র সভ্যতার সৃষ্টি করে। এই সভ্যতা মধ্যযুগকে খুবই প্রভাবিত করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্বরদের সভ্যতার কাঠামো বদলাতে লাগল। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে কিছু পরিবর্তন এল—যেমন নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত হল সামন্ততন্ত্র, দশম শতাব্দী থেকে হল শহরের উৎপত্তি ও শহর জীবন, পূর্ব দেশগুলোর সঙ্গেও পশ্চিম দেশগুলোর যোগাযোগ স্থাপিত হল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি- এই নিয়ে গড়ে উঠল মধ্যযুগ। সমাজ ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এখানে কোন একতা ছিল না। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময় পূর্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় সমাজে বণিকশ্রেণী দেখা দেয়। তখন এক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজ ছিল উদার। বণিকেরা গড়ে তুলল শহর। শহরগুলো হয়ে উঠল সভ্যতার কেন্দ্র। শহরবাসীর নতুন অর্থ নৈতিক জীবনের সঙ্গে নতুন করে নানা বিদ্যাচর্চাও আরম্ভ হল। এইরূপে মধ্যযুগের শেষে সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন এল। এক নতুন সভ্যতার পত্তন হল।

দ্বিতীয় পাঠ | ভারতে মধ্যযুগ

ঐতিহাসিকেরা পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের এবং পুর্বে ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই মোটামুটি মধ্যযুগের সূচনা ধরে থাকেন। হুণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে ভারতবর্ষের

রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন উত্তরভারতে কতকগুলো ছোট ছোট রাজ্য দেখা দিল। এদের মধ্যে কোনও রকমের একতা ছিল না। গুপ্ত রাজাদের সময় কতকগুলো সামন্ত রাজ্য ছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তরাজা মহাসেন গুপ্তের সামন্ত ছিলেন। পল্লব রাজাদের অধীনেও সামন্ত রাজ্য ছিল।

যে রাজনৈতিক ঐক্য গুপ্ত যুগের পর ভেঙ্গে গিয়েছিল, সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের সময় সেই রাজনৈতিক ঐক্য উত্তর ভারতে ফিরে আসে। কিন্তু দক্ষিণভারত, চোল, চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজাদের অধীনে আদিভারতীয় সভ্যতাকে ধরে রাখে। চালুক্য রাজাদের অধীনে দক্ষিণভারত সবদিক দিয়ে উত্তরভারত থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। হর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য আবার নষ্ট হয়ে যায়। কতকগুলো স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। রাজপুতরাই এই রাজ্যগুলি স্থাপন করে। রাজপুত জাতির উদ্ভব ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই সময়ে বাংলাদেশে পাল-সেন রাজাদের অধীনেও নানাদিকে উন্নতি হয়। এইরূপে হর্ষের পর প্রায় তিন'শ বছর ধরে ভারতের নানাস্থানে শিল্প সাহিত্য সব কিছুরই উন্নতি হয়েছিল। দক্ষিণ-ভারত, উত্তর-ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। রাজ্য বিস্তারের চেয়ে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়। তাঁর সময় ভারতের সংস্কৃতিক ঐক্য আবার দেখা গেল। ঠিক এই সময় এল আরবদের আক্রমণ ও সিন্ধুবিজয়। মুসলমানদের ভারত বিজয় এরও কয়েক'শ বছর পরের ঘটনা। তবে আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের এই মেলামেশার ফল ভালই হয়েছিল। কারণ আরবরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আরবদের সঙ্গে মেলামেশা করেও ভারতবাসীর মনের কোন পরিবর্তন হয়নি! এর প্রায় তিন'শ বছর পরে আসে গজনীর মামুদের ভারত আক্রমণ। মামুদের অল্প পরে আসেন মহম্মদ ঘুরী যাঁর সময়ে উত্তর ভারতে মুসলমান রাজ্য গড়ে ওঠে ও ইসলাম ধর্মের

প্রসার হয়। ঘুরীর পরে মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খল্‌জী বাংলাদেশে ইসলামী রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতে ইস্‌লামী রাজ্য আরও পরে গঠিত হয়।

প্রথমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিল ছিল না। কিন্তু দুই সভ্যতা পাশাপাশি অনেক কাল এক সঙ্গে থাকায় একে অন্যের ওপর প্রভাব ফেলে। গড়ে ওঠে নতুন সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি। তবে বিন্ধ পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতে তার প্রভাব পড়েনি। যার ফলে আদি ভারতীয় সভ্যতার রূপ, সংস্কৃতি ও শিল্প আজও সেখানে দেখা যায়।

তৃতীয় পাঠ | মধ্যযুগের বিচিত্র সভ্যতা

মধ্যযুগ সম্বন্ধে একটা কথা প্রথমেই মনে রাখতে হবে। এই যুগে পৃথিবীর সব জায়গায় ঠিক একই ধরণের সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। একই ভাবে সভ্যতা এগিয়ে যায় নি। কোথাও সভ্যতা তাড়াতাড়ি এগিয়েছে। কোথাও ধীরে ধীরে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও আবার পুরানো সভ্যতা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন করে সমাজ ও সভ্যতা গড়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। ভারত ও চীনের সভ্যতা জীবিত থাকলেও অচল হয়ে পড়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেল। নতুনভাবে সমাজ গঠন হল। ধার্মিক খৃস্টান রাজাদের চেষ্টায় খৃস্টধর্মের প্রসার ঘটল। নতুন রাজ্যের জন্ম হল। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে রেষারেষি চলতে লাগল। এই সময় পৃথিবীর ইতিহাসে রাশিয়ার জন্ম হল।

এদিকে উত্তর ইউরোপ থেকে নর্মানরা এসে দক্ষিণ ও পশ্চিমের দেশগুলো আক্রমণ করল। ১০৬৬ খৃস্টাব্দে নর্মানরা উইলিয়মের অধীনে ইংলণ্ড জয় করল। স্পেন ছাড়া ইউরোপ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল। জার্মানীতে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। কিন্তু সবগুলো মিলে যে একটা দেশ হয়ে উঠবে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। রাশিয়ার ক্ষমতা পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। ইউরোপে এইভাবে ভাঙ্গাগড়া চলছিল। সমাজে কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। জার্মানী ও ইটালিতে কিছু নগর গড়ে উঠেছিল। ফ্রান্সে প্যারিস ছিল একটা বিখ্যাত নগর। এইসব নগরের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ক্রমে এরা একটা আলাদা শ্রেণীতে পরিণত হল।

সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় থেকে একাদশ শতাব্দীতে মামুদের ভারত অক্রমণের সময় পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ বছরের মধ্যে উত্তর-ভারতে অনেক রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বহু জাতি, বহু সভ্যতা, বহু মতবাদকে নিজের করে নিয়ে হিন্দুসভ্যতা বিরাট আকার নিয়েছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বেই ভারতীয় সভ্যতা চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মালয়েশিয়া ও কাম্বোডিয়াতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হয়েছিল। চীনের পথধরে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি জাপান ও কোরিয়াতে পৌঁছেছিল।

পশ্চিম এশিয়ায় আরব সভ্যতা আরবে, প্যালেস্টাইনে, সিরিয়ায় ও মেসোপটেমিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ইরাণে প্রাচীন পারসিক সভ্যতার সঙ্গে নতুন আরব সভ্যতা মিশে গিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি দেশে আরব পারস্যের মিশ্রসভ্যতা এবং ভারত ও চীনের সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। এযুগের এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় ইউরোপের দেশগুলো অনেক পিছিয়ে ছিল। গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলনা বললেই চলে। ইউরোপের পূর্বে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল ও পশ্চিমে স্পেনেই যা কিছু ছিল।

অনুশীলনী

১। দু এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মোটামূটি কত খৃস্টাব্দ থেকে কত খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলে ?

(খ) চারটি প্রাচীন সভ্যতার নাম কর।

(গ) মধ্য যুগে কারা শহর গড়ে তুলে ছিল ?

(ঘ) কাদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায় ?

(ঙ) শঙ্করাচার্যের সময় ভারতে কি পরিবর্তন দেখা দিল ?

(চ) কারা ইংলণ্ড জয় করেছিল ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — যুগের শেষ ও — যুগের আরম্ভের মাঝামাঝি সময়টাই ছিল মধ্যযুগ।

(খ) — সময় পূর্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় সমাজে — শ্রেণী দেখা দেয়।

(গ) সপ্তম শতাব্দীতে — সময় আবার — ঐক্য ফিরে আসে।

(ঘ) — ও ইটালিতে বড় বড় নগর গড়ে উঠেছিল।

(ঙ) — — কর্তৃত্ব নিয়ে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে রেষারেষি ছিল।

৩। নীচে কতগুলো প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি √ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর :—

প্রশ্ন :—(ক) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন কবে হয় ?

(খ) চালুক্যরা কোথায় রাজত্ব করত ?

(গ) কারা ১০৬৬ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করে ?

উত্তর :—(ক) ১৪৫৩ খৃস্টাব্দ, ৪৭৬ খৃস্টাব্দ, ১০৬৬ খৃস্টাব্দ।

(খ) উত্তরভারত, বাংলাদেশ, দক্ষিণভারত।

(গ) হূণ, নর্মান, আরব জাতি।

৪। কোন সময়ে মধ্য যুগের সূচনা হয় ? মোটামুটি কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত মধ্য যুগ ? ইউরোপে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য কি ?

৫। ভারতে কোন সময় মধ্যযুগের সূচনা হয় ? ভারতে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৬। মধ্যযু গের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পাঠ

পশ্চিমে মধ্যযুগ

রোমে বর্বর জাতির আগমন ও বিস্তার ঃ—এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমানরা ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি। সেইজন্যে রোমানরা বিশ্বাস করত তাদের সাম্রাজ্যের পতন নেই। কিন্তু এই সাম্রাজ্য একদিন ভেঙ্গে পড়ে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে রোমে বিভিন্ন বর্বর জাতির আক্রমণ ও তাদের বসতি বিস্তার। বর্বরেরা অনেকবার রোম আক্রমণ করে। এরা রোমানদের মত সভ্য ছিল না বলেই রোমানরা এদের বর্বর বলত। এরা ছিল **টিউটনিক** বা **জার্মান** জাতির লোক। এদের মধ্যে **ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ অস্ট্রোগথ, ভ্যাণ্ডাল, লম্বার্ড,** প্রভৃতি উপজাতিগুলো ছিল প্রধান। **জুলিয়াস সীজার** ও রোমান ঐতিহাসিক **ট্যাসিটাসের** লেখা বই থেকে এদের কথা জানা যায়।

পণ্ডিতেরা বলেন এটা মাইগ্রেশনের যুগ বা দেশ থেকে দেশে যাবার সময়। এই উপজাতিরা ঘোড়ায় টানা চার চাকার **ওয়াগন** গাড়ীতে তাদের সমস্ত মালপত্র নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বাস করত। খাদ্যের অভাবই এর প্রধান কারণ। ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের জমি ভালো, সেখানে থাকার সুবিধেও ছিল, সেইজন্যে বর্বরেরা সেখানে গিয়েই বাস করতে লাগল।

এই সময় **হুণ** নামে সত্যিসত্যিই এক বর্বর জাতি ছিল। হুণেরা দেখতে যেমন কুৎসিত, স্বভাবেও ছিল তেমনি হিংস্র। এরা প্রথমে মধ্য-এশিয়ায় কোন এক জায়গায় থাকত। কোন কারণে দু'দলে ভাগ হয়ে হুণেরা একদল ইউরোপ ও অন্যদল ভারতবর্ষের দিকে যায়। তখন জার্মান জাতির লোকেরা **রাইন** ও **ড্যানিয়ুব** নদীর অঞ্চলগুলোতে বাস করত। সুযোগ পেলেই তারা রোমের মধ্যে

রোমে বর্বর জাতির বিস্তার
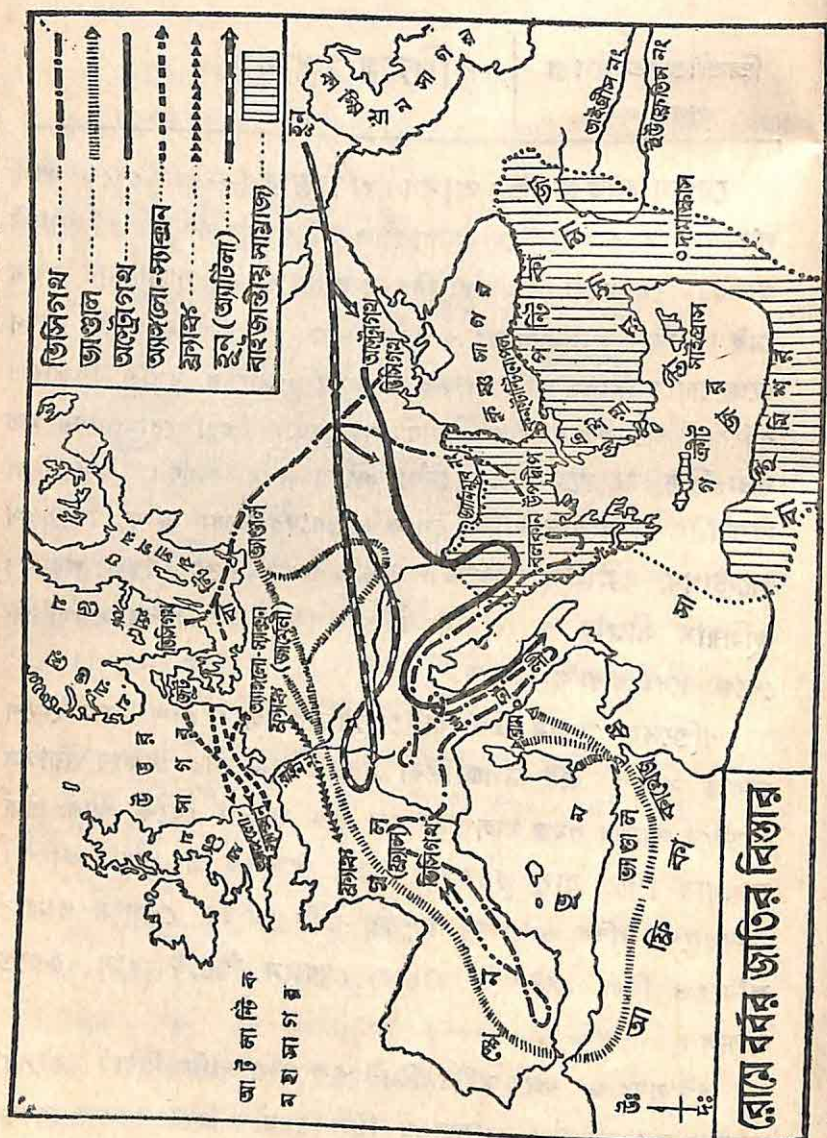
ঢুকে পড়ে লুঠপাট করত। হুণেরা আসছে শুনে তারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে রোমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষে হুণদের চাপে **ভিসিগথেরা** রোমে আশ্রয় নেয়। এরা **স্পেন** ও **দক্ষিণ গলে** গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিল। হুণ বীর **অ্যাটিলাকে** পরাস্ত করতে ভিসিগথেরা রোমানদের সাহায্য করেছিল। এই সময় রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভিসিগথদের দেখাদেখি ভ্যাণ্ডালরাও রোমে ঢুকে পড়ে। ৪৫৫ খৃস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালেরা রোম অধিকার করে। কিছু পরে আফ্রিকায় এবং সিসিলি, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপেও নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। বার্গাণ্ডীয়রা গলের দক্ষিণপূর্বে রাজ্য গঠন করেছিল। **অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন** ও **জুট** উপজাতিরা ব্রিটেনে এবং ফ্রাঙ্করা বর্তমান ফ্রান্সে (গলে) গিয়ে বাস করতে লাগল। রোমের পশ্চিমভাগের সাম্রাজ্য কেবল ইটালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল। বর্বরদের এই বিস্তার রোমের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এদের মধ্যে কেউ কেউ রোমের শাসন মেনে নিল। কেউ সৈন্যদলে যোগ দিল। রোমের দরবারে জার্মান সেনাপতিদের ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল। রোমের সম্রাটেরা তাদের হাতের পুতুল হয়ে উঠলেন। ৪৭৬ খৃস্টাব্দে এক জার্মান সেনাপতি রোমের সম্রাটকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সম্রাট হন। এইভাবে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। পরে অস্ট্রো-গথদের রাজা **থিওডরিক** ৪৯৩ খৃস্টাব্দে রোম দখল করেন।

থিওডরিক দশ বছর কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে কাটিয়েছিলেন। তিনি রোমান আইন ও সংস্কৃতি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি রোমান আইনগুলোকে রক্ষা করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলেও তার আদর্শ বজায় ছিল। পূর্বরোম সাম্রাজ্য সেই আদর্শকে ধরে রাখতে চেষ্টা করল।

দ্বিতীয় পাঠ | অ্যালারিক, অ্যাটিলা ও জেনসিরিক

অ্যালারিক :—হুণদের ভয়ে ভিসিগথেরা ড্যানিয়ুব নদীর দক্ষিণে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু রোমের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রোম সম্রাটের কর্মচারীরা তাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। সেইজন্য তারা বিদ্রোহ করল। অ্যালারিক নামে এক নেতার অধীনে তারা তিনবার রোম আক্রমণ করে। অ্যালারিক কিন্তু যথেষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি খৃস্টান ধর্ম নিয়েছিলেন ; অ্যালারিক রোমকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। বাইরের সঙ্গে রোমের যোগাযোগ রইল না। খাদ্যের অভাব হওয়াতে রোমানরা তাঁকে ধনরত্ন দিয়ে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। অ্যালারিক রোমের সমস্ত ধনরত্ন চেয়ে বসলেন। রোমের লোকেরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আমাদের কি থাকবে ?" অ্যালারিক উত্তর দিলেন "কেন ? তোমাদের প্রাণ।" অনেক ধনরত্ন দিয়ে রোমের লোকেরা সেবার মুক্তি পেল।

অ্যালারিক রোমের সম্রাটের সঙ্গে আপস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে সম্রাটের সঙ্গে আপস না হওয়ায় তিনি আবার রোম আক্রমণ করেন। তিনদিন ধরে রোম লুঠ করে যা কিছু দামী দামী জিনিষ পান সবই নিয়ে যান। নিজে খৃস্টান ছিলেন বলে গির্জা-গুলো বাঁচে এবং রোমানদেরও প্রাণে মারেন না। এরপর অ্যালারিক আফ্রিকায় রোমের উপনিবেশগুলো জয় করার ইচ্ছা করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন রোমের ঐ উপনিবেশগুলো জয় করতে পারলে রোমের ক্ষমতা কমে যাবে। কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ হবার আগেই তিনি মারা যান।

অ্যাটিলা :—অ্যালারিকের মৃত্যুর কিছু পরেই হুণেরা তাদের নেতা অ্যাটিলার অধীনে রোম-সীমান্তে উৎপাত আরম্ভ করে!

অ্যাটিলার রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপের রাইন নদী পর্যন্ত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণসাগর থেকে বল্কান উপদ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চল জয় করে তিনি লুঠতরাজ করেন। তিনি প্রায় ৭০টি নগর ধ্বংস করেছিলেন। কনস্ট্যান্টি-নোপ্‌ল পর্যন্ত গেলে সম্রাট থিওডোসিয়স্‌ তাঁকে অনেক ধনরত্ন দিয়ে নগর রক্ষা করেন। রোম সাম্রাজ্যের দুই অংশই অ্যাটিলাকে কর দিত। অ্যাটিলা যখন গলদেশ আক্রমণ করেন তখন রোমান ও গথ সৈন্য মিলে ৪৫১ খৃস্টাব্দে তাঁকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি ইটালি আক্রমণ করে মিলান শহর লুঠ ও ধ্বংস করেন। তিনি ইটালিতে দ্বিতীয় অভিযান করবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিয়ের দিন একটি ভোজ হয়। ভোজের শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। অ্যাটিলার রোম আক্রমণ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পোপের অনুরোধে তিনি রোম আক্রমণ করেননি। অ্যাটিলার পর তাঁর রাজ্য টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। তাঁর মত নিষ্ঠুর রাজা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না। অ্যাটিলার মৃত্যুর পর ইউরোপের লোক বাঁচে।

জেনসিরিক:—অ্যাটিলা মারা গেলেও রোম কিন্তু রেহাই পেল না। ৪৫৫ খৃস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা রোম আক্রমণ করে। এই ভাণ্ডালদের এক নেতা ছিলেন জেনসিরিক। তিনি ৪২৯ খৃস্টাব্দে আফ্রিকাতে রোমের যে উপনিবেশ ছিল সেগুলো দখল করেন এবং কার্থেজকে রাজধানী করে একটা রাজ্য গড়ে তোলেন। জেনসেরিক ৪৫৫ খৃস্টাব্দে কার্থেজ থেকে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে টাইবার নদী পার হয়ে রোমে এসে পৌছান। পোপ তৃতীয় লিও তাঁকে রোম আক্রমণ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জেনসিরিক চৌদ্দ দিন ধরে রোম লুঠ করেন এবং ত্রিশ হাজার রোমকে দাস হিসেবে নিজের রাজ্যে নিয়ে যান। এইভাবে একের পর এক বর্বর জাতিরা রোম আক্রমণ করে কিছু দিন ধরে এক একটা অঞ্চল নিয়ে বাস করত। সুযোগ বুঝে একদিন তাদেরই একজন রোমে সম্রাট হয়ে বসল।

তৃতীয় পাঠ | বর্বরদের সমাজ, শ্রেণী, শাসন ও ধর্ম

সমাজ :—বর্বরদের সমাজ, শাসন, ধর্ম ইত্যাদির কথা আমরা সীজার ও ট্যাসিটাসের লেখা বই থেকে জানতে পারি। জার্মানরা ছিল খুব সাহসী, সৎ ও যোদ্ধা। তারা গ্রামে বাস করত। গ্রামের চার দিকে ছিল কৃষিজমি। গ্রাম চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকত। খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে তারা থাকত। চাষবাস, শিকার, মাছধরা পশুপালন এই ছিল তাদের জীবিকা। বলদে টানা লাঙ্গলের সাহায্যে তারা চাষ করত। গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি ছিল গৃহপালিত পশু।

এদের সমাজে তিন শ্রেণীর লোক বাস করত। প্রথম শ্রেণীতে থাকতেন রাজা এবং বড় বড় সর্দারেরা, তারপর সাধারণ লোক ও সব নীচে **সার্ফ** বা **দাসশ্রেণীর** লোকেরা। সার্ফরা চাষ করত। তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। জুয়া খেলা তাদের খুব প্রিয় ছিল। জুয়ায় হেরে গেলে তারা অনেক সময় দাসত্ব মেনে নিত। জার্মানদের আদি সমাজ ছিল কৃষি প্রধান। গ্রাম ও পরিবারকে কেন্দ্র করে পিতৃপুরুষের প্রাধান্য মেনে নিয়ে তারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করত। এদের সমাজে স্ত্রীজাতিকে খুবই সম্মান করা হত।

শাসন :—জার্মান উপজাতিগুলোর মধ্যে কোন একতা ছিল না। আলাদা, আলাদা রাজার অধীনে তারা থাকত। প্রত্যেকটা উপজাতির মধ্যে কতকগুলো ছোট ছোট দল ছিল। এই রকম এক একটা ছোট দলে থাকত এক'শ করে যোদ্ধা। এদের সঙ্গে এদের স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও থাকত। সব চেয়ে ছোট হল গ্রাম। গ্রামের একটা নিজস্ব **সভা** ছিল। তার ওপরে ছিল **হাণ্ড্রেড**। সেখানে থাকত একটা **সমিতি**। সকলের ওপরে ছিল **জাতীয় সভা**। দেশের কোন যোগ্য পরিবার থেকে যোগ্য লোককে রাজা করা

হত। রাজা ছিলেন দলপতি। জাতীয় সভা রাজা নির্বাচন করত। এই সভার ক্ষমতা ছিল অসীম। তারা যুদ্ধ, সন্ধি, সবই ঘোষণা করতে পারত। পরে অবশ্য রাজার ক্ষমতা বাড়ে। এক কথায় প্রথম দিকে উপজাতিগুলোর শাসন ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক। গোড়ার দিকে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট অধিকার ছিল।

ধর্ম ঃ— জার্মান উপজাতিগুলো প্রকৃতির পূজো করত। সমাজে পুরুত শ্রেণী ছিল না। প্রত্যেক বাড়ীর কর্তাই পুরুতের কাজ করত। তবে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে একজনকে পুরুত হিসেবে বেছে নেওয়া হত। ওডিন ও থর ছিলেন এদের প্রধান দেবতা। এদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল খুবই সরল ও গভীর। রোমের কাছে আসাতে খৃস্টান ধর্মের প্রভাব এদের ওপর পড়ে। উপজাতিগুলো খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। প্রথমে গথেরা খৃস্টান হয়।

ধীরে ধীরে এইসব উপজাতিরা রোমের মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধারার সঙ্গে নিজেদের রীতিনীতি মিশিয়ে নিয়ে তারা ইউরোপে এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে।

অনুশীলনী

১। কয়েকটি টিউটনিক জাতির নাম কর। কেন, কোথায় এবং কিভাবে তারা বসতি বিস্তার করে তার বর্ণনা দাও।

২। অ্যালারিক কে ছিলেন? তাঁর বিষয়ে কি জান বল।

৩। অ্যাটিলার সম্বন্ধে যা জান বল।

৪। বর্বরদের সমাজ জীবনের বর্ণনা দাও।

৫। বর্বরদের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) হূণদের চাপে — রোমে আশ্রয় নেয়।

(খ) — গলের দক্ষিণ-পূর্বে রাজ্য স্থাপন করেছিল।

(গ) — খৃস্টাব্দে থিওডরিক ইটালিতে প্রভুত্ব বিস্তার করেন।

(ঘ) ৪৫৫ খৃস্টাব্দে — রোম অধিকার করে।

(ঙ) বর্বরদের প্রধান দেবতার নাম ছিল — ও —।

৫। নীচে কতকগুলি প্রশ্ন ও সেগুলির উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর :—

প্রশ্ন :—

(ক) রোমে বিদেশী হানাদারেরা কোন জাতির লোক ছিল?

(খ) কোন হূণ নেতা রোম আক্রমণ করেন?

(গ) থিওডরিক কে ছিলেন?

(ঘ) কে মিলান শহর লুঠ করেছিলেন?

উত্তর :—

(ক) হূণ জাতির, বর্বর জাতির, টিউটনিক জাতির।

(খ) জেনসিরিক, অ্যাটিলা, অ্যালারিক।

(গ) ভিসিগথদের রাজা-অস্ট্রোগথদের রাজা, ভ্যাণ্ডালদের রাজা।

(ঘ) অ্যাটিলা, জেনসিরিক, অ্যালারিক।

৬। দু এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) দুটি টিউটনিক জাতির নাম কর।

(খ) রোমে ঢোকার আগে বর্বর জাতির লোকেরা কোন কোন নদীর কূলে বাস করত?

(গ) ভ্যাণ্ডালরা কবে গল অধিকার করে?

(ঘ) ফ্রান্সে কারা গিয়ে বসবাস করেছিল?

(ঙ) অ্যালারিক কবার রোম আক্রমণ করেন?

(চ) গল আক্রমণ করলে কারা অ্যাটিলাকে হারিয়ে দেয়?

(ছ) জার্মানদের আদি সমাজ কি ধরণের ছিল?

(জ) জার্মান উপজাতিদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

(ঝ) কোন উপজাতি প্রথমে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে?

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পাঠ

ইউরোপে অন্ধকার যুগের কথা

অন্ধকার যুগ : একটি অলীক ধারণা—পশ্চিমে রোম ও গ্রীস এবং পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীকে একদিন আলো দেখাত। কিন্তু সব সাম্রাজ্য চিরকাল থাকে না। রোম সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে গেল। কিছুকাল পরে ভারতের গুপ্ত সামাজ্যেরও পতন হল। পৃথিবীর দুটো দিকে দুটো সমৃদ্ধ সভ্যতার শেষ হল। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের আরম্ভ হয়। এই যুগকে বলা হল **অন্ধকার যুগ** কারণ গ্রীক ও রোমান সভ্যতা যা পৃথিবীকে সভ্য করেছিল তা চিরদিনের জন্যে নিভে গেল। আসলে একটা বিশেষ যুগের শেষ হল।

কেউ কেউ বলেন ইউরোপে 'অন্ধকার যুগের' মূলে ছিল খৃস্টধর্ম। এই খৃস্টধর্ম যীশুর খৃস্টধর্ম নয়। এ হচ্ছে সরকারি খৃস্টধর্ম যা রোম-সম্রাট কন্স্টানটাইনের খৃস্টান হবার পর প্রসার লাভ করেছিল। তাঁরা বলেন ঐ ঘটনার পর প্রায় হাজার বছর জ্ঞানের উন্নতি হয়নি, যুক্তি এবং চিন্তাধারা কিছুই ছিল না। সমাজে নানা রকমের গোঁড়ামি দেখা গিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্র-গুলো উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রগুলোতে সেই পুরোনো কালের আদর্শ ও আচার-ব্যবহারের কথা লেখা ছিল। সে সব বিষয় নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারত না। এই ভাবে ইউরোপে এল 'অন্ধকার যুগ'। সক্রেটিস ও প্লেটোর যুগ চলে গেল। লোকের একমাত্র কাজ হল লড়াই করা। হাজার বৎসরের ওপর যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা লোপ পেল। অতীত ঢাকা পড়ে গেল। এই ধ্বংসের ওপর গড়ে উঠতে লাগল নতুন সভ্যতা, নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী' এই সভ্যতা গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে ছিল আলাদা। অবশ্য প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভতা থেকে তারা অনেক কিছু শিখল, অনেক

কিছু ধার করল। কিন্তু এই শেখার প্রণালী ছিল খুবই শক্ত এবং সময়ও লেগেছিল অনেক। সেইজন্যে মনে হয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের সভ্যতা যেন ঘুমিয়ে ছিল। এই কারণেই ঐ শতাব্দীগুলোকে বলা হত "অন্ধকারের যুগ"।

দ্বিতীয় পাঠ | মধ্যযুগে শিক্ষা

মধ্যযুগের সূচনাতে সত্যিই কি পৃথিবী পিছিয়ে পড়েছিল? তখন কি মানুষের অনেকদিনের পরিশ্রম করে শেখা জ্ঞান সবই লোপ পেয়ে গিয়েছিল? এই সব প্রশ্ন মানুষের মনে দেখা দিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। তবে এই অন্ধকার যুগেরও একটা ইতিহাস আছে। যে সব বর্বর জাতি ইউরোপে ঢুকে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল, তারাও রোম ও গ্রীসের উন্নত সভ্যতাকে নিজেদের সভ্যতার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এক নতুন সভ্যতা গড়েছিল। একদল জ্ঞানী বলে থাকেন ইউরোপে এই খৃস্টধর্মের জন্যেই যা কিছু সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে একথা বলেন যে খৃস্টধর্ম ও যাজকদল এই "অন্ধকার যুগে" শিক্ষা এবং শিল্পকলাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন অনেক অমূল্য বই। ভারতে বৌদ্ধ বিহারের মত ইউরোপেও অনেক খৃস্টসঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। সেখানে প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। খৃস্টান সন্ন্যাসীরা সাধ্যমত চেষ্টা করতেন শিক্ষা ও শিল্পকলার চর্চা করতে। লোকের মধ্যে সেই সব তাঁরা ছড়িয়ে দিতেন। শিক্ষার আলো যে একেবারে নিভে যায়নি এটাই তার প্রমাণ। এই সময় সেন্ট বেনিডিক্ট ও কাসিওডোরাসের মত দু একজন মনীষী জ্ঞানের আলো জ্বেলে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন

কাসিওডোরাস ছিলেন ভিসিগথদের রাজা থিওডরিকের উপদেষ্টা। এই থিওডরিক বর্বরদের রাজা হলেও মধ্যযুগে শিক্ষা ও শিল্পের প্রসারের জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

কাসিওডোরাস শিক্ষা প্রসারের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনেক অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করে মঙ্কদের দিয়ে নকল করিয়েছিলেন। গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় লেখা অনেক বই তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করা হয়েছিল। তিনি একটা বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লিখেছিলেন যার অনেকখানি জুড়ে ছিল ব্যাকরণ, অঙ্ক, তর্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, ছন্দ, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। এই সময়ের আর এক মনীষী ছিলেন গ্রেগরী তিনি ফ্রাঙ্কদের ঐতিহাসিক ছিলেন। "বর্বরদের হেরোডোটাস" নামে তিনি পরিচিত। এই প্রসঙ্গে মহাজ্ঞানী বীড্ এর নামও স্মরণীয়। ইনি নর্দামব্রিয়ার একজন মঙ্ক ছিলেন। টাইন নদীর তীরে জারোর আশ্রমে তিনি শিক্ষা দিতেন। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞান লাভ করত। দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগের মঠগুলো মঙ্কদের কঠোর পরিশ্রম শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের জন্যে সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মানুষ এখানে এলে পেত শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়। পরবর্তীকালে এই মঠগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়।

তৃতীয় পাঠ

ধর্মীয় ধারণা থেকে সভ্যতার প্রেরণা

মধ্যযুগে খৃস্টানদের চার্চগুলো ইউরোপে গণ্ডগোলের সুযোগে খুবই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। তবে এর আগেও চার্চের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অ্যাটিলা পোপ লিওর অনুরোধে রোম আক্রমণ না করে ফিরে যান। এর ফলে পোপের প্রভাব আরও বেড়ে যায়

রাজা এবং পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এই ধারণা মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে। অন্ধবিশ্বাস, আনুগত্য ও বশ্যতা তাদের মনকে ছেয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষ মনে করত জীবন আনন্দের জন্যে। অন্যদিকে চার্চগুলো বলত জীবন আনন্দের জন্যে নয়। মরণের পরে যে জগৎ আছে জীবন তার চেয়ে কম সুখের। এই ধারণা অনেকের মধ্যে এমনই জন্মেছিল যে তারা মঠগুলোর চারদেওয়ালের মধ্যে নিজেদের আট্‌কে রাখত। বর্বরদের বলা হত চার্চের উপরেই তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। খৃস্টধর্মই তাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। যে বর্বরেরা রোম ধ্বংস করেছিল, যাদের সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিল না খৃস্টধর্মের প্রভাবে তারা গড়ে তুলল এক মিশ্র সভ্যতা। পলিমাটি যেমন উর্বর, খৃস্টধর্ম গ্রহণের পর বর্বরদের মন হয়ে উঠল তেমনি। নতুন ভাবধারা তাদের নতুন পথ দেখাল। ধীরে ধীরে মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠল। চিন্তাশীল লোকেরা চার্চের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে বিষিয়ে তুললেন। মানুষের মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল। মানুষ যুক্তি এবং প্রশ্ন করতে শিখল। এতদিন পাপ পুণ্যের বিষয় নিয়ে মানুষ ব্যস্ত ছিল। এখন সে কিছু গড়বার কাজে মন দিল। নতুন সমাজ, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সাহিত্য, নতুন স্থাপত্য সব কিছুই গড়ে উঠল। জন্ম হল এক নতুন ধরণের সভ্যতার।

অনুশীলনী

১। দু' এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) মধ্য যুগের আর এক নাম কি? (খ) পৃথিবীকে আলো দেখাত কোন কোন সভ্যতা? (গ) ক্যাসিওডোরাস কে ছিলেন? (ঘ) কাকে বর্বরদের "হেরোডটাস" বলা হয়? (ঙ) বীড্‌ কে ছিলেন? (চ) অ্যাটিলা কার অনুরোধে রোম আক্রমণ করেননি?

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) কেউ কেউ বলেন ইউরোপে — যুগের মূলে ছিল —।

(খ) অন্ধকার যুগে সমাজে নানা — দেখা দিয়ে ছিল।

(গ) — ও প্লেটোর যুগ চলে গেল

(ঘ) — ও — মত হু একজন মণীষী জ্ঞানের আলো জেলে রাখতে চেষ্টা করে ছিলেন।

(ঙ) কাসিওডোরাস একটি — লিখেছিলেন।

(চ) খৃস্ট ধর্মের প্রভাবে বর্বররা এক — গড়ে তুলেছিল।

৩। মধ্য যুগকে "অন্ধকার যুগ" বলা হয় কেন? এই যুগের বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৪। মধ্যযুগে মঠ গুলোতে কিভাবে শিক্ষা চর্চা হত? এই সময়ের হুজন মণীষীর নাম কর। তাঁদের সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর।

৫। কিভাবে সভ্যতার প্রেরণা মানুষ পেয়েছিল তার বর্ণনা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পাঠ

বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা

কনস্ট্যান্টিনোপল্ঃ সাম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের কিছু পরে **কন্‌স্ট্যাণ্টাইন** রোমের সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রাচীন যুগের একজন বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। কৃষ্ণসাগরের তীরে **বাইজ্যান্টিয়ম** নামে একটা গ্রীক উপনিবেশ ছিল। কন্‌স্ট্যাণ্টাইন সম্রাট হয়ে এই বাইজ্যান্টিয়ম শহরে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যান। তাঁর নাম অনুসারে এই শহরের নাম হয় **কনস্ট্যাণ্টিনোপল্**। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়া জুড়ে যে বিশাল রোম সাম্রাজ্য ছিল সম্রাটদের পক্ষে রোম শহর থেকে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। শাসনের সুবিধের জন্যে তখন থেকে রোম হল পশ্চিমদিকের অর্দ্ধেকটার রাজধানী আর কনস্ট্যান্টিনোপল্ হলো পূর্বদিকের রাজধানী। দুই দিকের দুই সাম্রাজ্যের শাসনভার দুজন সম্রাটের ওপর পড়ল। সঙ্ঘবদ্ধ রোম সাম্রাজ্য দুটুকরো হয়ে গেল।

৪৭৬ খৃষ্টাব্দের পর বর্বরদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য লোপ পায়। কিন্তু বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনরের সমৃদ্ধ জায়গাগুলো ও সিরিয়া এবং মিশর নিয়ে যে পূর্ব রোমন সাম্রাজ্য ছিল তা অনেকদিন টিকে যায়। এরই রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে বসে সম্রাটেরা রোমের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। কনস্ট্যাণ্টাইন উপযুক্ত জায়গাতেই পূর্বরোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর পত্তন করেন। বস্‌ফরাস্ প্রণালীর উপকূলে ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। সামনে সমুদ্র, অন্যদিকে এসিয়া। বাণিজ্যের সুবিধাও ছিল। শহরটা ছিল সুরক্ষিত। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সম্রাট মনের মত করে রাজধানী গড়েছিলেন। রোম থেকে ভালো ভালো মূর্তি ও শিল্পকলার কাজ এনে নতুন রাজধানীকে সাজিয়ে ছিলেন। কনস্ট্যাণ্টাইন যে নতুন নগর তৈরি করেছিলেন তার গৌরব হাজার

বছর ধরে থাকে। নতুন শহর, নতুন নামকরণ হলেও পুরানো নামের স্মৃতি থেকে যায়। সেইজন্যে পূর্ব রোমসাম্রাজ্যকে বলা
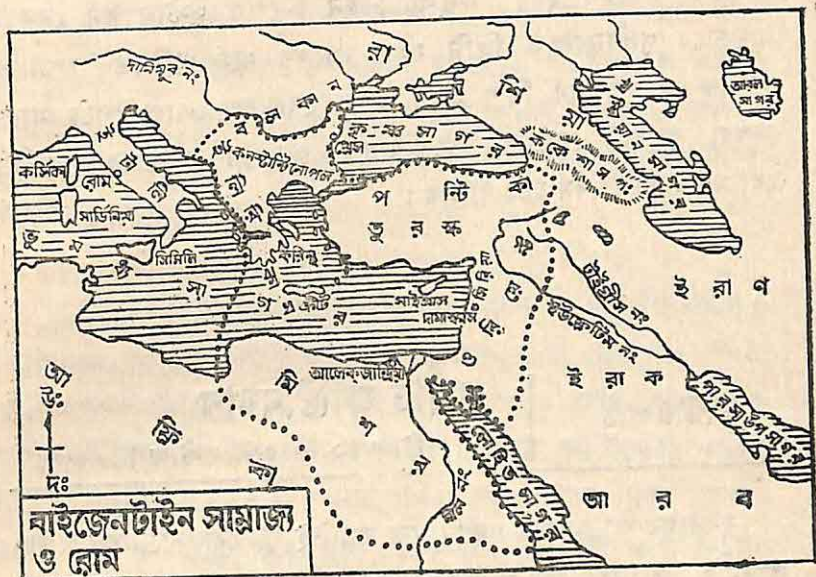
হয় বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য। এই সভ্যতার নাম হয় বাইজ্যান্টাইন সভ্যতা।

কন্‌স্ট্যানণ্টাইন ও খৃস্টধর্ম ঃ রোম সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের (খৃঃ ১৬১—১৮০ খৃঃ) সময় থেকে, খৃস্টান ও রোমানদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। এই ঝগড়া অনেকদিন ধরে চলে। সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের সময় (খৃঃ ২৮৪—৩০৫ খৃঃ) ঝগড়া আরও বেড়ে যায়। তিনি মনে করতেন যারা তাঁকে পূজো করবে তারাই আসল ভক্ত। খৃস্টানরা ঈশ্বর ছাড়া মানুষকে পূজো করত না। ফলে হাজার হাজার খৃস্টানদের তিনি হত্যা করেন। খৃস্টানেরা এতে দমে না গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্মপ্রচার করে। রোমে দিন দিন খৃস্টানদের সংখ্যা বেড়ে যায়। কন্‌স্টাণ্টাইন যখন সম্রাট হলেন রোমের অধিকাংশ লোকই তখন খৃস্টান। সম্রাট বুঝলেন যে ডায়োক্লিসিয়ানের অত্যাচারে খৃস্টানেরা বিরক্ত ও ভীত।

সেইজন্যে তিনি ৩১৩ খৃস্টাব্দে খৃস্টানদের অভয় দিয়ে প্রচার করেন যে, কোন খৃস্টানকে হত্যা করা হবে না। খৃস্টানধর্ম সারা রাজ্যের ধর্মরূপে পরিচিত হয়। কন্‌স্ট্যাণ্টাইন নিজেও খৃস্টান ধর্ম নেন। এইভাবে খৃস্টানধর্মকে তিনি সমগ্র দেশের ধর্মে পরিণত করেন। অন্যান্য যে সব ধর্ম ছিল ধীরে ধীরে সেগুলো লোপ পেয়ে যায় অথবা খৃস্টধর্মে সেগুলো মিশে যায়। পঞ্চম শতাব্দীর পর খৃস্টধর্মই রোমের একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পাঠ

সম্রাট জাষ্টিনিয়ান

(খৃস্টাব্দ ৫২৭—৫৬৫ খৃস্টাব্দ)

বর্বরদের আক্রমনের সময় থেকে সম্রাটই পূর্ব রোমসাম্রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন জাষ্টিনিয়ান। তিনি ৫২৭ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। ইলিরিয়ার এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাঁর প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। রাতেও তিনি কাজ করতেন। তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। শোনা যায় তিনি ঘুমোবার দরকার বোধ করতেন না। সাধারণ লোকের পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।

জাষ্টিনিয়ান

সেইজন্যে লোকে মনে করত যে তাঁর ওপরে "অশুভ আত্মা" ভর করছে।

সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের পর রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। সম্রাটেরা নিজের নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা পশ্চিমে বর্বদের আক্রমণ ঠেকাতে পারলেন না। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা পুরোদমে চলছিল। অবশেষে জাষ্টিনিয়ান সম্রাট হলেন। তিনি সম্রাট হয়ে রোমের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। এই কাজে তিনি তাঁর বুদ্ধিমতী রানী থিয়োডোরার সাহায্য পেয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যের ঐক্য তাঁর আগেই অনেক অংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। বর্বর জাতির আধিপত্য নষ্ট করে তিনি ইটালি ও অখণ্ড রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য কিছুটা সফলও হয়েছিল। সম্রাটের সেনাপতিরা ভ্যাণ্ডালদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকা, অষ্ট্রোগথদের হাত থেকে ইটালির কিছু অংশ উদ্ধার করেন। ভিসিগথ-দের কাছ থেকে দক্ষিণস্পেন জয় করেন। গথদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আগে তিনি পারস্যের সঙ্গে এক সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, এশিয়ামাইনর থেকে এক বিরাট আক্রমণের সামনে পড়তে হয়ে ছিল। পূর্ব সীমান্তে পারস্যের সাসানীয় বংশের সম্রাটদের সঙ্গে জাষ্টিনিয়ানের অনেকদিন যুদ্ধ চলেছিল। অবশেষে বার্ষিক কর দিয়ে পারসিকদের সঙ্গে মিটমাট করেন। এই যুদ্ধে বিশেষ কোনও ফল হয়নি। কেবলমাত্র সম্রাটের অর্থক্ষয় এবং সৈন্যক্ষয় হয়েছিল। কন্‌স্টাণ্টাইনের মত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে তিনি বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল তিনি চিরস্থায়ী ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমের দেশগুলোকে জয় করতে পারেন নি। কিন্তু একথা ঠিক যে তিনি তা করবার চেষ্টা করেছিলেন। জাষ্টিনিয়ানের কৃতিত্বে মনে হয়েছিল অখণ্ড রোম সাম্রাজ্য বোধ হয় আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এই বিরাট সাম্রাজ্য সামলাবার মত ক্ষমতা বাইজাণ্টাইনের সম্রাটদের

ছিল না। তাঁর বংশধরেরা বিজিত জায়গাগুলো নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেননি।

ইটালিতে অভিযান চালাবার জন্যে জাষ্টিনিয়ান বেলিসারিয়াস নামে এক সুদক্ষ সেনাপতির সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বেলিসারিয়াসের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ অংশ নিয়েছিলেন। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর চেষ্টাতেই উত্তর আফ্রিকা এবং ইটালিতে রোম সাম্রাজ্যের অধিকার আবার ফিরে আসে। কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলে জাষ্টিনিয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বেলিসারিয়াসের চেষ্টায় বিফল হয়। ইটালি জয় করার পর ইটালির গথেরা তাঁকে রাজা করতে চেয়েছিল, তিনি তাতে রাজী হননি। কিন্তু এত করেও তিনি সম্রাটের মন পাননি। তাঁর জনপ্রিয়তার জন্যে সম্রাট তাঁকে হিংসা করতেন। ফলে তাঁকে সরে যেতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার গথদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে বেলিসারিয়াসকে ফিরিয়ে আনা হয়। রোম অবরোধ করতে গিয়ে বেলিসারিয়াস মারা যান।

তৃতীয় পাঠ | জাষ্টিনিয়ানের আইন সংহিতা

জাষ্টিনিয়ান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে তিনি চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু শিল্প, আইন ও রাজস্ব ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি রোমান আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং সেগুলোর সংকলন করান। এই কারনেই জাষ্টিনিয়ান বিখ্যাত হয়েছিলেন। জাষ্টিনিয়ান যখন সম্রাট হন তখন তিনি দেখলেন দেশে যে আইনগুলো চলেছে তাতে

অনেক গলদ আছে। এই আইনগুলোর মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। কিছু কিছু আইন পরস্পর বিরোধী ছিল।

তাছাড়া আইনগুলোর কোন সংকলনও ছিল না। সেগুলো ভালো করে পরীক্ষাও করা হয়নি। এইজন্যে ন্যায় বিচার এবং শাসন করাও ছিল শক্ত কাজ। এইসব গলদ দূর করবার জন্যে জাষ্টিনিয়ান একটা কমিশন গঠন করেছিলেন। ঐ কমিশনের কাজ ছিল আইনগুলো সংগ্রহ করা, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা এবং সেগুলোকে সংকলিত করা। এই ব্যাপারে বিচারক ও আইন-বিদ্‌দের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলোও নেওয়া হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ঠিকভাবে বিচারকদের পথ দেখান। কেবল তাই নয়, রোমান আইনের মূল তত্ত্বগুলো নিয়ে আইন-ছাত্রদের জন্যেও একটা বই লেখা হয়। এর ফলে ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা হয়।

রোমান আইন ও বিচার কি তা বোঝাবার জন্যে জাষ্টিনিয়ান অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। জাষ্টিনিয়ান বুঝেছিলেন তাঁর পরিশ্রম বিফল হবে না বা কোন দিন মুছে যাবে না। কারণ মানুষ যখন শাসনেয় চাপে ক্লান্ত ও অসহায় বোধ করবে তখন তাঁর সংহিতা থেকে মানুষ নতুন জীবনের পথ খুঁজে পাবে। জাষ্টিনিয়ান এবং তাঁর সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে অনেকদিন আগেই মুছে গেছে। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর কীর্তির জন্যে আজও বেঁচে আছেন। তাঁর আইনের সংকলন প্রকাশের পর থেকে সমস্ত সাম্রাজ্যে রোমান আইনের প্রসার হয়। পরের যুগে জাষ্টিনিয়ানের আইন সংগ্রহ ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। আজও অনেকদেশে জাষ্টিনিয়ানের এইসব আইনকানুন লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকে।

চতুর্থ পাঠ

জাষ্টিনিয়ানের শিল্প ও স্থাপত্য-প্রীতি ও বাইজ্যাণ্টাইন শিল্প

জাষ্টিনিয়ান যে কেবল আইন সংকলন করিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন তা নয়। ধর্ম, সংগীত এবং শিল্পকলাতেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কনস্টাণ্টিনোপলের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন। তাঁর এই প্রেরণা তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও উৎসাহ দিয়েছিল। এই সময় কনস্টাণ্টিনোপলে বহু স্থপতি বাস করত। জাষ্টিনিয়ান তাদের দিয়েই শহরে বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ, সেতু ও স্নানাগার তৈরি করেছিলেন। এইজন্যে সম্রাটকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। সম্রাটের সাহায্য ও প্রেরণায় এক নতুন স্থাপত্যরীতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই স্থাপত্যরীতি বাইজান্তীয় স্থাপত্যরীতি নামে পরিচিত। তবে এই স্থাপত্যরীতির ওপর প্রাচ্য স্থাপত্যকলার প্রভাব পড়েছিল। ৫৩২ খৃস্টাব্দে কনস্টাণ্টিনোপল শহরে জাষ্টিনিয়ান সেণ্টসোফিয়া নামে একটা গির্জা তৈরি করান। প্রায় পাঁচবছর ধরে দশ হাজার লোক এটা তৈরি করেছিল। গির্জাটার কারুকার্য খুবই সুন্দর। এর ওপরে যে গম্বুজটা আছে সেটা দেখে লোকে আজও অভিভূত হয়। গির্জাটার ভিতরের খিলানের কাজও অপূর্ব। ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে তুর্কীরা কনস্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করে এবং গির্জাটির ধনদৌলত নিয়ে যায়। গির্জাটিও মসজিদে পরিণত হয়।

বাইজ্যাণ্টাইনের চিত্রকলাও বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল। প্রাসাদ প্রভৃতি সাজাবার জন্যে মোজেইক শিল্পের কাজছিল এখানকার লোকেদের প্রধান শিল্প। টুকরো টুকরো রঙীন পাথর ও কাঁচ দিয়ে শিল্পিরা গির্জা, প্রাসাদের দেওয়ালে, ছাদে, মেঝেতে

নানা রকমের ছবি আঁকত। তাকেই বলা হত মোজেইক। এসব ছাড়াও শিল্পীরা সোনারূপার ওপর মীনার কাজেও পটু ছিল। হাতীর দাঁতের ওপর খোদাই করার কাজও তারা করত। সৌখিন আসবাব পত্র তৈরি, হীরা জহরৎ কেটে পালিশ করার কাজেও বাইজ্যাণ্টাইন শিল্পীরা খুব দক্ষ ছিল। তাদের শিল্প কাজের নমুনা দেখলে মনে হয় শিল্পীরা জটিল জিনিসই বেশী পছন্দ করত।

পঞ্চম পাঠ | (ক) বাইজ্যাণ্টাইনের ব্যবসা-বাণিজ্য

কনস্ট্যাণ্টাইন যখন কনস্ট্যাণ্টিনোপল শহর তৈরি করেন তখন তিনি উপযুক্ত জায়গা দেখেই রাজধানী বসান। সামনে সমুদ্র, অন্যদিকে এশিয়া। এই নগরের ভৌগোলিক অবস্থা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে উপযুক্ত। সাম্রাজ্যের সব জায়গা থেকেই সব জায়গায় সহজেই যাওয়া যেত। তাছাড়া এখান থেকে নদী পথে রাশিয়ায় যাওয়ার সুবিধাও ছিল। মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি উন্নত দেশগুলো ছিল এই শহরের কাছেই। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে এবং এশিয়া ও ইউরোপের মাঝখানে থাকায় পূব-পশ্চিমের যত বাণিজ্য এখান থেকেই হত।

স্থলপথে চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মিশর ও লোহিত সাগর ধরে সিংহল ও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এই সব দেশ থেকে নানা রকমের জিনিষ আসত। প্রকাণ্ড বাজার ও ভালো বন্দর থাকায় সেখানে সারা দুনিয়ার মূল্যবান জিনিষের বেচাকেনা চলত। ইথিওপিয়া, সিংহল ও ভারতবর্ষ থেকে লোহিত সাগর দিয়ে জিনিষপত্র আনা হত। রাশিয়া থেকে আসত

চামড়া, মোম ও মধু। ভারত ও সিংহল থেকে আসত দামী দামী রত্ন। চীন থেকে আনা হত রেশম। তখনকার দিনে চীন ছাড়া আর কোথাও রেশম হত না। কারণ যে গুটি পোকা থেকে রেশম হয় তার চাষ চীনে হত। চীনারা তাদের দেশের বাইরে গুটিপোকা নিয়ে যেতে দিত না। জাষ্টিনিয়ানের আমলে চীনে পারস্যের দুজন সাধু বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁরা ফাঁপা বেতের ভেতরে গুটিপোকার ডিম কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। তখন থেকেই বাইজ্যান্টাইনে রেশম শিল্প গড়ে ওঠে। এখান থেকেই ধীরে ধীরে এই শিল্প সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার জন্যে এরা জাহাজ ব্যবহার করত।

(খ) বাইজ্যান্টাইনের সংস্কৃতি

বাইজ্যান্টিয়াম্ ছিল সে সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। তীর্থযাত্রী, শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা এই শহরে ভীড় করে ছিল। বাইজ্যান্টিয়ামের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বোগদাদ। মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি সভ্য ও উন্নত দেশের কাছে ছিল এই দেশ। বাইজ্যান্টাইন রাজ্যের জন্যই পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব হয়েছিল। কারণ পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোর কাছে থাকায় এবং বর্বর জাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ায় বাইজ্যান্টিয়াম প্রায় হাজার বছর ধরে তার সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করে ছিল।

জাষ্টিনিয়ানের মাতৃভাষা ছিল ল্যাটিন। শাসন কার্যে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ঐ ভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্যে কোন শক্তিশালী লেখক ছিলেন না। সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ ভাষার কোনও স্থান ছিল না। জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর কয়েকটা অনু-

শাসন গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। ফলে গ্রীক ভাষা নতুন জীবন পেয়েছিল। জাষ্টিনিয়নের পরেই রোম সাম্রাজ্যে গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়ে। দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা শাখায়, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভ্রমণ-কাহিনী, কাব্য, উপন্যাস, গল্প উন্নত গ্রীক সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ স্থান করে নেয়। গলদেশে ফরাসীভাষা বিশেষ স্থান পেয়েছিল।

এই সময় বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের নৌ-সেনারা শত্রুর জাহাজ ধ্বংস করবার জন্যে বারুদের মত এক রকম জিনিষ ব্যবহার করত। এর নান ছিল গ্রাক ফায়ার। লম্বা লম্বা নলের ভেতর দিয়ে একরকম তরল জিনিষ শত্রুদের জাহাজে ছুঁড়ে দেওয়া হত। এতে জাহাজে আগুন লেগে জাহাজ পুড়ে যেত। জল দিয়েও আগুন নেভানো যেত না। রসায়ন বিদ্যা না জানলে এই ধরণের জিনিষ আবিষ্কার করা যায় না। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে বাই-জ্যান্টিয়ামে বিজ্ঞানের চর্চা ভালভাবেই হত।

খৃস্টধর্মে এই সময়ে দুটো ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়—গ্রীকমত ও রোমান মত। গ্রীকমতের পৃষ্ঠপোষক ছিল কন্স্টান্টিনোপলের গির্জা, আর রোমান মতের পৃষ্ঠপোষক ছিল রোমের গীর্জা। জাষ্টিনিয়ান এই দুই মতের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সফল হন নি।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — তীরে বাইজ্যান্টিয়াম নামে একটা গ্রীক উপনিবেশ ছিল।

(খ) — — কে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হয়।

(গ) কন্স্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীন নাম ছিল —।

(ঘ) জাষ্টিনিয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র — চেষ্টায় বিফল হয়।

(ঙ) — — নামে একটা গির্জা তৈরি করান।

২। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — (জাষ্টিনিয়ান/কনস্টান্টাইন/ডায়োক্লিসিয়ানের) নাম অনুসারে শহরের নাম কনস্টান্টিনোপল।

(খ) জাষ্টিনিয়ানের সঙ্গে — (ইটালির/রোমের/পারস্যের) অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল।

(গ) ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে — (গথেরা/তুর্কীরা/পারসিকরা) কনস্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করে।

(ঘ) রোমান আইন বিধিবদ্ধ করেছিলেন — (জাষ্টিনিয়ান/ডায়োক্লিসিয়ান/কনস্টাণ্টাইন)।

৩। ডান পার্শ্বে কতকগুলো নাম ও বাম পার্শ্বে কতকগুলো নাম দেওয়া আছে। বাম পার্শ্বের যে নামের সঙ্গে ডান পার্শ্বের যে নামের সম্বন্ধ আছে ডান পার্শ্বের সেই নম্বরটা বন্ধনীর মধ্যে বসাও—

বামপার্শ্ব		ডানপার্শ্ব
(ক) বাইজ্যাণ্টিয়ম্	( )	১। সাসানীয় বংশ।
(খ) কৃষ্ণ সাগর	( )	২। গ্রীকউপনিবেশ।
(গ) জাষ্টিনিয়ান	( )	৩। জাষ্টিনিয়ান।
(ঘ) পারস্য	( )	৪। কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল।

৪। **দু এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) কোন সাম্রাটের পর কন্‌স্ট্যাণ্টাইন সম্রাট হন? (খ) কোন্ সময় হতে রোমান ও খৃস্টানদের মধ্যে বিরোধ হয়? (গ) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন কখন হয়? (ঘ) জাষ্টিনিয়ান কোন বংশে জন্মে ছিলেন? (ঙ) বেলিসারিয়াস কে ছিলেন? (চ) জাষ্টিনিয়ান কি জন্যে বিখ্যাত? (ছ) সেণ্ট সোফিয়া গির্জাটি কবে মসজিদে পরিণত হয়? (জ) কনস্ট্যণ্টি-নোপলে কারা গুটি পোকা নিয়ে আসে?

৫। কনস্টাণ্টিনোপল কোথায়? এর প্রাচীন নাম কি? কেন এবং কে সেখানে রাজধানী পরিবর্তন করেন? কোন সভ্যতাকে কেন বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা বলা হয়?

৬। জাষ্টিনিয়ান কে ছিলেন? তিনি কিভাবে সাম্রাজ্যের ঐক্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন?

৭। জাষ্টিনিয়ান আইন সংহিতা করেছিলেন কেন? কি ভাবে তিনি এই সংহিতা সংকলন করান, এই বিষয়ে যাহা জান বল।

৮। বাইজ্যাণ্টিয়াম্ কোন কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করত" বাইজ্যাণ্টিয়াম সাম্রাজ্যের ব্যবসা সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৯। বাইজ্যাণ্টাইন সংস্কৃতি কিরূপ ছিল বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রথম পাঠ

হজরৎ মহম্মদ ও ইসলামের কাহিনী

আরব দেশ ও আরবজাতি ঃ—যীশুখৃস্টের জন্মের প্রায় ছ'শ বছর পরে হজরৎ মহম্মদ নামে এক মহাপুরুষ আরব দেশের মক্কা শহরে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করেন। ইহুদী ও খৃস্টধর্ম যেখানে প্রচার হয়েছিল সেই প্যালেস্টাইন থেকে আরব দেশ বেশী দূরে নয়। এই দেশটা ছিল লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মাঝে। এর উত্তরে নদ-নদী থাকায় সে জায়গাগুলো ছিল উর্বর। সেইসব জায়গায় প্রাচীনকালে কয়েকটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যেমন উত্তর-পূর্বে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা এবং উত্তর-পশ্চিমে ছিল ফিনিসীয় সভ্যতা। কিন্তু আরব দেশের দক্ষিণ ভাগে ছিল এক বিশাল মরুভূমি; আর এখানে ওখানে কয়েকটা মরুদ্যান ছিল। সমুদ্রের ধারে উর্বর জায়গাতে মরুদ্যানে গড়ে উঠেছিল কয়েকটা গ্রাম ও শহর। লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এই রকম দুটো শহর ছিল মক্কা ও মদিনা।

মহম্মদের আগে আরব দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। একদিন আরব দেশের লোকেরাই প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, ইহুদী ও ফিনিসীয় সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। যারা আরবে থেকে গেল তারা কিন্তু অনুন্নতই রইল। তাদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠী ছিল। দলগুলোর মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগেই থাকত। শহরে কিছু কিছু লোক থাকত। বাণিজ্য ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। উর্বর জায়গাগুলোতে চাষ-আবাদ করত। আর একদল লোক থাকত মরুভূমিতে। এরা তাঁবুতে বাস করত। এদের বেদুইন বলা হয়। বেদুইনদের

প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন ও লুঠপাঠ করা। মরুভূমিতে তারা উট ও ঘোড়ার পিটে চড়ে বেড়াত আর মরুযাত্রীদের লুঠ করত। এদের প্রাণের মায়া ছিল না। এরা ছিল দুঃসাহসী ও স্বাধীনতা প্রিয়। বেদুইনরা অনেক গোষ্টিতে বিভক্ত ছিল। সব সময় গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকত। আরবীয়েরা রুক্ষ হলেও খুব অতিথি বৎসল ছিল। শত্রু অতিথি হলে তারা শত্রুরও কোন অনিষ্ট করত না। এরা নানা কুসংস্কারে ভুগত। এদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা ছিল। বহু দেবদেবীর পূজা, মূর্তি পূজা এমন কি পাথর ও গাছপালার পূজাও এরা করত। মক্কার কাবা শরিফ্ ছিল এদের প্রধান ধর্মমন্দির। এখানে একটা কালো রঙের পাথর আছে। এই পাথরটি আরবীয়দের কাছে খুবই পবিত্র। মুসলমানেরা আজও কাবা শরিফে হজ্ করতে যায়। সকল দেবতার মধ্যে আল্লাই প্রধান, এটাই তারা মনে করত। কবিতা ও সংগীতের প্রতি ভালবাসা এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। আরবী ভাষায় পুরাকালে অনেক গান ও কবিতা লেখা হয়। ইস্‌লামধর্মের প্রসারের পরও এইসব গান ও কবিতা আরবী সাহিত্যে স্থান পায়।

দ্বিতীয় পাঠ | হজরৎ মহম্মদ ও তাঁর বাণী

৫৭০ খৃস্টাব্দে মক্কা শহরে কোরেশ বংশে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবা আবদুল্লা মারা যান। মহম্মদের বয়স যখন ছ বছর তখন তাঁর মা আমিনাও মারা যান। তিনি পিতামহ ও পিতৃব্যের কাছে মানুষ হন। লেখাপড়ার সুযোগ মহম্মদ পান নি। কিন্তু নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং ভাবুক প্রকৃতির। একটু বড় হলে তিনি তাঁর পিতৃব্য আবুতালিবের

সঙ্গে দূর দূর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেতেন। এই সময় তিনি খৃস্টান ও ইহুদী ধর্মের সংস্পর্শে এসে আরবদের মধ্যে যে কুসংস্কার ছিল সেগুলো দূর করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে তিনি খাদিজা নামে এক ধনবতী রমণীর অধীনে চাকরি নেন। খাদিজা তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। খাওয়া পরার অভাব না থাকায় মহম্মদ মক্কার কাছে 'হেরো' নামে পাহাড়ের গুহায় তপস্যা আরম্ভ করেন। এই সময় ভগবানের দূত **গ্যাব্রিয়েল** তাঁকে ঈশ্বরের বাণী শোনান, "—বল মহম্মদ আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নেই। মহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ", মহম্মদ এই বাণী প্রচার করেন। এইভাবে ইস্‌লাম ধর্মের জন্ম হয়। ইস্‌লাম কথার মানে হল, ভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করা। যাঁরা এই ধর্মে বিশ্বাস করেন তাঁদের মুসলমান বলা হয়।

প্রথমে মহম্মদের স্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন ছাড়া বিশেষ কেউ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল না। এই ধর্ম প্রচারের পর আরব দেশের পুরোহিত-দের স্বার্থের ক্ষতি হয়। তারা মহম্মদকে প্রাণে মারতে চেষ্টা করে। ফলে বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাতে মহম্মদ ৬২২ খৃস্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনাতে পালিয়ে যান। এই সময় থেকে মুসলমানেরা হিজিরা অব্দ গণনা করে। মদিনার লোকেরা মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে। মদিনার লোকেরা মহম্মদের নতুন ধর্মের সমর্থক ও রক্ষক হিসাবে মহম্মদের পাশে দাঁড়ায়। এরাই **আনসার** বা সহায়ক নামে পরিচিত হয়। মক্কাবাসীরা মহম্মদকে ধ্বংস করতে মদিনা আক্রমণ করে। মহম্মদ বদরের যুদ্ধে তাদের হারিয়ে দেন। এই যুদ্ধের ফল দেখে আরব দেশের বেশীর ভাগ দলপতি ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদকে তাঁদের নেতা বলে মেনে নেন। ৬২৯ খৃস্টাব্দে মহম্মদ মক্কায় যান। দু বছরের মধ্যে সমস্ত মক্কা জয় করেন। মক্কাবাসীরা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মহম্মদের বাণী :—মহম্মদের জীবনী ও বাণী "কোরান শরীফ গ্রন্থে লেখা আছে। বেদ ও গীতা আমাদের কাছে যেমন পবিত্র

"কোরান শরীফ" মুসলমানদের কাছে তেমনি পবিত্র। ইসলাম-ধর্মের মূল কথা হল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সর্বশক্তিমান। মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। এছাড়াও ইস্‌লামধর্মের প্রধান পাঁচটি উপদেশ হল—এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা, মক্কার দিকে মুখ করে নমাজ পড়া বা প্রার্থনা করা, জাকাৎ বা আয়ের একটা অংশ গরীব-দুঃখীদের জন্যে দান করা, ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার জন্যে সরকারকে কর দেওয়া, বিশেষ বিশেষ দিনে উপোস করা, এবং জীবনে একবার মক্কা ও মদিনাতে হজ্‌ বা তীর্থ যাত্রা করা। এইগুলো প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য-কর্তব্য। মহম্মদ সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে, শত্রুকে ক্ষমা করতে, প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে, মা-বাবাকে ভক্তি করতে এবং স্ত্রীলোকদের শ্রদ্ধা করার কথাও বলেছিলেন। প্রত্যেক মুসলমান ভাইভাই, একথাও তিনি বলেছিলেন।

মহম্মদ কতকগুলো সামাজিক সংস্কারও করেছিলেন। মদ্যপান, কন্যাসন্তান হত্যা ইত্যাদি বন্ধ করেছিলেন। ক্রীতদাসদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে বলেছিলেন। এক সঙ্গে কেউ চারটির বেশী বিয়ে করতে পারবে না। এই সব সংস্কার করে তিনি আরব দেশে এক নতুন সমাজ গঠন করেন। অবশেষে ৬৩২ খৃস্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় ফিরে আসার তিন মাস পরে তিনি মারা যান।

ইস্‌লাম ধর্মের প্রসারের কারণঃ—ইস্‌লাম ধর্ম একটি গণ-তান্ত্রিক ধর্ম। এই ধর্মে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ ছিল না। ফলে আরব দেশে একতা আসে ও এক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এই ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে থাকে। আরবীয়েরা একজাতি একপ্রাণ হয়ে তাদের ধর্ম প্রচার করে। যারা তাদের ধর্ম গ্রহণ করেনি তাদের দেশ জয় করে আরবীয়েরা সেখানে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করে। ইস্‌লাম ধর্ম ছিল সহজ ও সরল। এর সরলতা সহজেই লোকের মনকে জয় করেছিল। ফলে মহম্মদের মৃত্যুর এক'শ বছরের মধ্যে আটলান্তিক মহাসাগর থেকে সিন্ধু-নদ পর্যন্ত বিশাল জায়গা জুড়ে

ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে এক বিস্তৃত মুসলমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

তৃতীয় পাঠ | খলিফাদের কাহিনী

মহম্মদের পর যাঁরা মুসলমানদের ধর্মগুরু হন তাঁদের **খলিফা** বলা হত। **আবুবকর, ওমর, ওসমান** ও **আলী** পর পর চারজন খলিফা হয়েছিলেন। এঁরা সাধু খলিফা বলে পরিচিত ছিলেন।

আবুবকর ছিলেন মহম্মদের শিষ্য ও বন্ধু। তিনি বিভিন্ন দিকে ইস্‌লামের প্রসার করেছিলেন। আবুবকর পণ্ডিত ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। **সিদ্দিক** বা সত্যবাদী তাঁর উপাধি ছিল। তাঁর সময় **সিরিয়া** এবং আরও কয়েকটা বড় বড় শহরে ইস্‌লাম ধর্ম ও রাজ্য বিস্তার হয়েছিল।

পরবর্তী খলিফা হন ওমর। ওমর এশিয়ামাইনর, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, পারস্য এবং ঈজিপ্টে মুসলমান সাম্রাজ্য ও ধর্মের প্রসার করেছিলেন। ওমরই এই চারজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই ইস্‌লাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক। প্রজাদের সুখদুঃখ নিজের চোখে দেখার জন্যে তিনি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। ওমর সমস্ত সাম্রাজ্যে সুশাসনের জন্যে এক শাসনতন্ত্র তৈরি করেছিলেন।

ওমরের পর খলিফা হন ওস্‌মান। তিনিও ইস্‌লামের প্রসার করেছিলেন। কিন্তু তিনি আততায়ীর হাতে খুন হওয়ায় মহম্মদের জামাতা আলী খলিফা হন। মহম্মদের অনুচরদের মধ্যে আলীই শেষ খলিফা। এই সময় ইস্‌লামে দলাদলি চলছিল। সিরিয়ার শাসনকর্তা **মুয়াবিয়ার** অধীনে আলীর শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর খলিফা থাকার পর আলী খুন হন। এইভাবে চারজন সাধু খলিফার শাসন শেষ হয়।

কারবালার যুদ্ধ ও মহরম : চারজন সাধুখলিফার পর খলিফা পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়। আলীর ছেলে ছিলেন **হাসান** ও **হুসেন**। খলিফা পদ নিয়ে হাসানের সঙ্গে মুয়াবিয়ার গণ্ডগোল বাধে। শেষে ঠিক হয় মুয়াবিয়া খলিফা হবেন। তাঁর পর হাসান খলিফা হবেন। মুয়াবিয়া হাসানকে খুন করান। মুয়াবিয়া মারা গেলে মুয়াবিয়ার ছেলে এজিদ খলিফা হন। এজিদ ছিলেন অত্যাচারী। হুসেন ছিলেন শান্ত ও ভদ্র। ইরাকের লোকেরা হুসেনকে খলিফা করতে চাইলেন। হুসেন তাদের কথায় বিশ্বাস করে কুফায় এসে পৌছলেন। কিন্তু সেখানে এসে বুঝলেন লোকে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। **ইউফ্রেটিস** নদীর তীরে তিনি কারবালায় শিবির স্থাপন করেন। এজিদের সৈন্যরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। কোনদিকে পালাবার রাস্তা ছিল না। তেষ্টার জল না পেয়ে এবং শত্রুদের আক্রমণে হুসেন সপরিবারে প্রাণ দেন। কারবালার এই হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে মুসলমানেরা প্রতি বছর **মহরম** পালন করেন।

খলিফা পদ নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় মুসলমানেরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পারস্য দেশের মুসলমান যারা আলীর ভক্ত তারা **শিয়া** এবং আরবীয় ও তুর্কী মুসলমানেরা **সুন্নী** নামে পরিচিত হল।

কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর মহম্মদের বংশ লোপ পায় এবং মুয়াবিয়ার বংশ (উম্মিয় বংশ) প্রায় এক'শ বছর খলিফারূপে শাসন করে। অবশেষে উম্মিয় বংশের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় বংশ খিলাফৎ লাভ করে।

হারুণ-অল্-রশীদ : আব্বাসীয় বংশের সময় আরব সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুণ-অল্-রশীদ। তিনি ৭৮৬ খৃস্টাব্দে খলিফা হন। ভারতবর্ষে যেমন বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে গল্প আছে, তেমনি হারুণ-অল্-রশীদকে নিয়েও সহস্র আরব্য রজনীর গল্প বা আরব্য উপন্যাস

লেখা হয়েছে। এই উপন্যাসের নানা গল্প থেকে তখনকার আরব সভ্যতা ও খলিফাদের রাজধানী বাগদাদ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। তখনকার সভ্য জগতের সকলেই হারুণ-অল্-রশীদের কথা জানতেন। চীনের সম্রাট ও ইউরোপ থেকে শার্লম্যান তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি খুব বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। ন্যায়বিচার ও সুশাসনের জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ। এসব ছাড়া তাঁর আরও নানা গুণ ছিল। প্রজাদের সুখদুঃখের কথা জানার জন্যে তিনি গভীর রাতে ছদ্মবেশে রাজধানীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।

হারুণ-অল্-রশীদের সময় তাঁর রাজধানী বাগদাদ ছিল পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ নগর। শহরটা ছিল গোলাকার এবং দুসারি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাগদাদ ছিল বাইজ্যান্টিয়ামের প্রতিদ্বন্দ্বী। সারা পৃথিবীতে সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং সাহিত্য ও শিল্পে বাগদাদের খ্যাতি ছিল। খলিফারা শহরটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছিল বিশাল। রাজ্যে শিল্পী, কবি, ব্যবসায়ী, গায়ক, জাদুকর, নর্তকী, ধনী, গরীব সব শ্রেণীর লোকই বাস করত। রাজপ্রাসাদে ছিল অসংখ্য কর্মচারী, সৈন্য আর ক্রীতদাস। দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা সেখানে যেতেন। তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হত।

চতুর্থ পাঠ | স্পেনে আরব সাম্রাজ্য

ইস্‌লাম সভ্যতার আর এক কেন্দ্র ছিল স্পেন। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইস্‌লামের অধিকার স্পেনে যায়। দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব, সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা থেকে দলে দলে মুসলমানেরা এখানে এসে বাস করতে

আরম্ভ করে। স্পেনের আরবেরা মুর নামে পরিচিত। সেইজন্যে
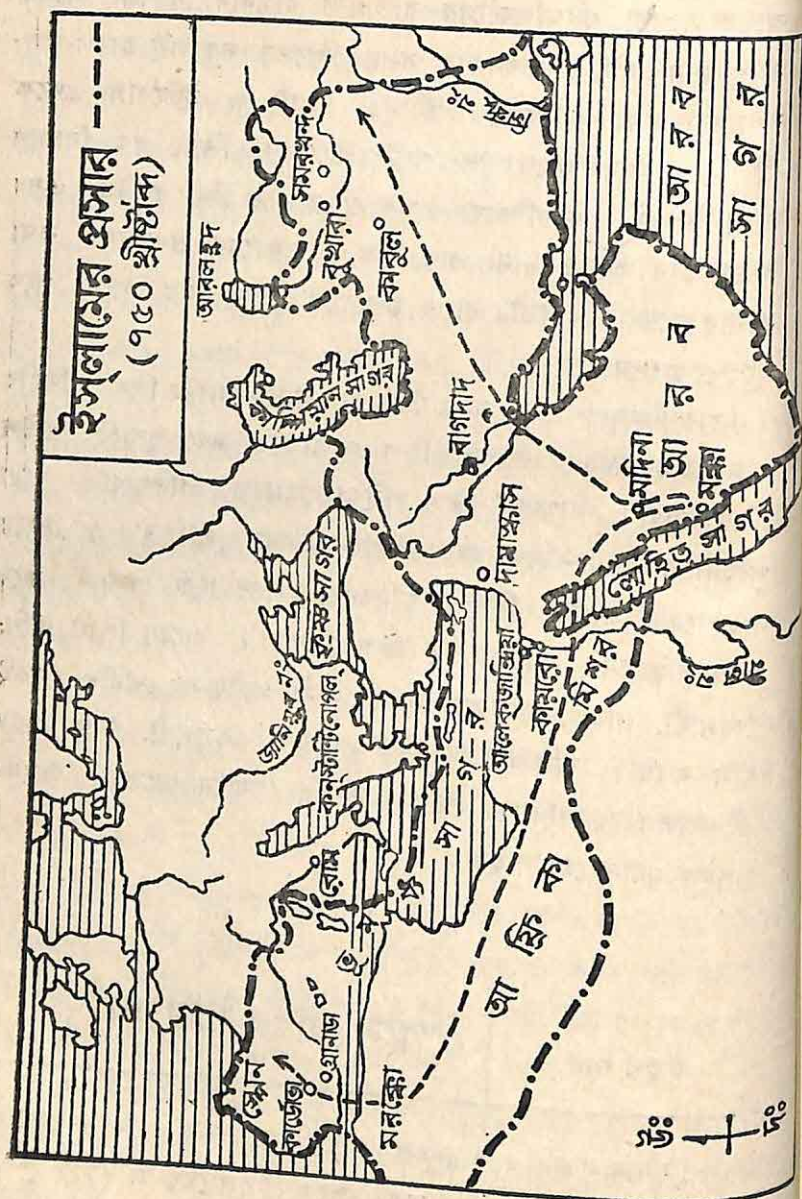
এই সভ্যতার নাম মুর সভ্যতা। ৭১১ খৃস্টাব্দে আরব সৈন্য জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে স্পেনে পৌঁছায়। এইভাবে বাগদাদ

থেকে স্পেন পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। আরব সেনাপতি **জিবেল্-অল্ তারিকের** নামানুসারে জিব্রালটার নাম হয়েছিল। এখানে উম্মায়েদ বংশ রাজত্ব করতেন। এই বংশের সুলতানেরা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদার। স্পেনে মূর অধিকার প্রায় সাতশো বছর টিকেছিল।

কর্ডোবাঃ করটুবা ছিল **পাঁচশো** বছর ধরে মূর রাজ্যের রাজধানী। ইংরেজিতে এই নামকে **কর্ডোবা** বলা হয়। কর্ডোবা শহরটা ছিল যেমন বড় তেমনি সুন্দর। বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট সবই সাজানো। শহরে দশলক্ষ লোক বাস করত। শহরটা লম্বায় ছিল ন' মাইল। শহরতলীর আয়তন ছিল চব্বিশ মাইল। এই শহরে প্রাসাদ ছিল ষাট হাজার, বসতবাটী ছিল দু'লক্ষ, আর দোকান ছিল আশি হাজার। শহরে অনেক গ্রন্থাগার ছিল। তার মধ্যে আমিরের নিজের গ্রন্থাগারটি সবচেয়ে বড় ছিল। এর বইসংখ্যা ছিল চার লক্ষ। কর্ডোবাতে সাতশ মসজিদ ও তিনশ স্নানাগার ছিল। অনেক মসজিদে কারুকার্য ছিল। থাম ও দেওয়ালের গায়ে লতাপাতার কাজ ছিল। এছাড়া মসজিদের গায়ে গাছের পাতার মত বিচিত্র জালি নক্সার কাজ দেখা যায়। এই শিল্পকে **আরাবেস্ক** বলা হয়। কর্ডোবার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিখ্যাত। দরিদ্র প্রজাদের জন্যে শহরে অনেকগুলো অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন "স্পেনের অধিকাংশ লোকই লিখতে পড়তে জানত। একজন জার্মান লেখক বলেছেন, "এ শহর সমস্ত বিশ্বের ভূষণস্বরূপ"।

গ্রানাডাঃ দক্ষিণ স্পেনে গ্রানাডা নামে একটা শহর ছিল। গ্রানাডার **আল্ হামরা** অর্থাৎ রক্তবর্ণ প্রাসাদ স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা। এটি মর্মর পাথরে তৈরি, উপরে সোনার কাজ করা, দেওয়ালে জাফরির কাজ ও রং তুলি দিয়ে আঁকা ছবি। নানা কারুকার্য ও মোজেক শিল্পে প্রাসাদটা ছিল খুবই সুন্দর। এছাড়া মাটির কাজ করা পাত্র, বস্ত্রশিল্প ও হাতীর দাঁতের কাজে স্পেন

বিশেষ উন্নতি করেছিল। স্পেনে তখন ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে চর্চা হত। কর্ডোবার মত গ্রানাডাতে তখন একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মধ্যযুগে স্পেন ইউরোপকে আলো দেখাত।

পঞ্চম পাঠ | সভ্যতার ক্ষেত্রে আরবের দান

আরবেরা মধ্য প্রাচ্যের লোক। বাণিজ্যের জন্যে তারা নানা দেশে ঘুরে বেড়াত। ফলে নানাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। এইজন্যে পূর্ব ও পশ্চিমে দুই সভ্যতার ধারাই তারা নিয়েছিল। সেইজন্যে আরবের সভ্যতাকে **মিশ্র সভ্যতা** বলা হয়। দশমিক সংখ্যা রীতির আবিষ্কার ভারতে হয়। আরবেরা ভারত থেকে এই প্রথা শিখে পশ্চিমের দেশে ছড়িয়ে দেয়। বীজগণিত আরবদের সৃষ্টি। আরবদের জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রেও আরবেরা উন্নতি করেছিল। অনেক মৌলিক পদার্থ তাদের আবিষ্কার। আতর, ওষুধ ও মদ তৈরির কাজে তারা নিপুণ ছিল। চীন থেকে কাগজ তৈরি শিখে পাশ্চাত্ত্য দেশে তারাই কাগজের ব্যবহার শেখায়। ইতিহাস রচনায় আরবীয়েরা নতুন পথ দেখায়। সংস্কৃতের পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো মুনাফা নামে এক সাহিত্যিক আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এক কথায়, আরব ছিল সে সময়ে সভ্যতার বাহক।

আরবের পাণ্ডিত্য ঃ আরবে এই সময় কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী ছিলেন। আবুসিনা ছিলেন চিকিৎসক ও দার্শনিক। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান

ও শিল্পশাস্ত্রের ওপর বই লেখেন। গ্রীক ও আরবী ভাষায় লেখা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বই পশ্চিমের বিদ্যালয়গুলোতে সতের শতাব্দী পর্যন্ত পড়ান হত। তিনি প্রায় এক'শ বই লেখেন। আবুসিনা ছিলেন জ্ঞানের খনি।

ইব্‌ন্ রুশদ্ ছিলেন স্পেনের একজন জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক। তিনি এ্যারিস্টট্‌লের বইয়ের উপর টীকা লেখেন। সেটি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হত। চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর তাঁর লেখা একটা বই আছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের মুসলমান পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে তিনি সব থেকে বিখ্যাত।

অল্-তবারী ছিলেন ঐতিহাসিক। তিনি কোরানের ওপর টীকা ও পৃথিবীর ইতিহাস লিখে বিখ্যাত হন। জীবনের শেষ চল্লিশ বছর প্রতিদিন তিনি ৪০ পাতা করে লিখতেন। আর একজন ঐতিহাসিক ছিলেন **ইব্‌ন-খলদুন**। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম **মকদ্দমা**। এই বই থেকে আরব, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়। ইতিহাসের ওপর ভূগোলের যে প্রভাব আছে, সে কথা প্রথম ইনিই বলেছিলেন।

অল্-বিরুণী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। গজনীর মামুদের দরবারে তিনি ছিলেন প্রধান রত্ন। ভারতবর্ষে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। কয়েকবার তিনি ভারতে এসেছিলেন। হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি **অল্-বিরুণীর-ভারত** নামে একটি বই লিখেন। তিনি জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রের ওপর অনেক কিছু লিখে গেছেন।

ইব্‌ন-বতুতা ছিলেন একজন পর্যটক। তিনি ছিলেন মরক্কোর অধিবাসী। পারস্য, মেসোপটেমিয়া, বুখারা, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশে তিনি গিয়েছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ও তাঁর দরবারে কিছুদিন সরকারী কাজও করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি সে সময়ের ভারতবর্ষ ও মুসলমান জগতের কথা লিখে গেছেন।

আরবী সভ্যতা ও আরবের মনীষীরা এইভাবে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

অনুশীলনী

১। দু এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) ইস্‌লাম ধর্ম কবে প্রচারিত হয়? (খ) কাবা শরিফ কোথায়? (গ) মহম্মদের পিতার নাম কি? (ঘ) ইস্‌লাম কথার অর্থ কি? (ঙ) আনসার কাদের বলা হত? (চ) "জাকাৎ" কথার অর্থ কি? (ছ) চারজন পুণ্যবান খলিফার নাম কর। (জ) উম্মিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঝ) হারুণ অল্ রশীদ কোন বংশের খলিফা ছিলেন? (ঞ) আল্‌হামরা প্রাসাদটি কোথায়? (ট) ইবন খলদুনের লেখা বইটির নাম কি? (ঠ) ইবন-বতুতা কোথাকার লোক ছিলেন? (ড) মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে কোন পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন?

২। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদগুলি একত্রিত করে লেখ :—

১। আনসার	ক। মহম্মদ।
২। কারবালা	খ। শার্লম্যান।
৩। কর্ডোবা	গ। এ্যারিস্টট্‌লের উপর টীকা।
৪। হারুণ অল্ রশীদ	ঘ। মদিনাবাসী।
৫। ইব্‌ন্ রুশদ্	ঙ। সিরিয়া।
৬। বদরের যুদ্ধ	চ। ইউফ্রেটিস।
৭। মুয়াবিয়া	ছ। স্পেন।

৩। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) 'হজ্" কথার অর্থ — (দুঃখীদের দান করা, প্রার্থনা করা, তীর্থযাত্রা করা)।

(খ) "সিদ্দিকি" বা সত্যবাদী ছিল — (আলি, ওমর, আবুবকর) এর উপাধি।

(গ) মুয়াবিয়ার পর খলিফা হন — (হুসেন, এজিদ্ ওসমান)।

(ঘ) হারুণ অল রশীদের রাজধানী ছিল — (কর্ডোবা, বাগদাদ, বাইজ্যান্টিয়ম)।

(ঙ) আলহাম্‌রা প্রাসাদটা ছিল — (কর্ডোবায়, বাগদাদ, গ্রানাডায়)।

৪। **ভ্রম সংশোধন কর :—**

(ক) মহম্মদ আব্বাসীয় বংশে জন্মেছিলেন। (খ) গ্যাব্রিয়েল ছিলেন মহম্মদের গুরু। (গ) পারস্য দেশের মুসলমানেরা স্থন্নী নামে পরিচিত। (ঘ) স্পেনে উর্ম্মিয় বংশ রাজত্ব করতেন। (ঙ) আবুসিনা ছিলেন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক।

৫। আরব দেশের অবস্থান কোথায়? মহম্মদের পূর্বে আরবজাতির বিবরণ দাও।

৬। হজরৎ মহম্মদের জীবনী আলোচনা কর। (৭) মহম্মদের ধর্মের মূল কথা কি ছিল? তিনি কি কি সামাজিক সংস্কার করেন? (৮) চারজন সাধু খলিফা সম্পর্কে আলোচনা কর। (৯) কারবালার যুদ্ধ কেন হয়েছিল? মহরম কি?

১০। হারুণ অল রশীদ ও তাঁর সময়ের বাগদাদের বিবরণ দাও।

১১। কত খৃষ্টাব্দে স্পেনে আরবীয় সভ্যতা প্রসার লাভ করে? স্পেনের আরবীয় সভ্যতাকে কি বলা হয়? কর্ডোবা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১২। চারজন আরবীয় মনীষীর নাম কর। তাঁদের মধ্যে যে কোন হুজনের বিষয় আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম পাঠ

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

[খৃঃ ৮০০—১২০০ খৃঃ]

শার্লম্যানের কথা ঃ পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে গেল তখন রোমের বিভিন্ন জায়গায় বর্বর রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথমে ফ্রাঙ্করাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাইন নদীর তীরে বর্তমান বেলজিয়ামের এক অংশে প্রথমে তারা একটা ছোট রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্য ধীরে ধীরে দক্ষিণে পিরিনিজ পর্বতমালা ও উত্তরে বর্তমান বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও জার্মানীকে নিয়ে গড়ে ওঠে। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা "প্রাসাদের মেয়র" নামে পরিচিত কর্মচারীদের হাতে ছিল। এই রকম একজন মেয়র ছিলেন **চার্লস মার্টেল**। তিনি স্পেনের মুসলমানদের আক্রমণ রোধ করেছিলেন। তাঁর ছেলে ছিলেন **পিপিন**। পিপিন নামমাত্র রাজাকে সরিয়ে দিয়ে রাজা হন। পিপিনেরই ছেলে **শার্লম্যান**। তাঁর আসল নাম "চার্লস"। সম্রাট হলে পর তাঁকে "চার্লস দি গ্রেট" বলা হয়। শার্লম্যান এই কথার ফরাসীরূপ।

শার্লম্যান

এগিন হার্ড নামে চার্লসের এক বন্ধু ছিলেন। তাঁর লেখা শার্লম্যানের জীবনী থেকে আমরা শার্লম্যানের চেহারা, চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পারি। তিনি ছিলেন সাতফুট লম্বা, সুন্দর ও বলবান। তলোয়ারের এক আঘাতে তিনি নাকি সওয়ার সমেত একটা ঘোড়াকে মাটিতে ফেলে দিতে পারতেন। সম্রাট ফ্রাঙ্কদের জাতীয় পোষাক ছাড়া পরতেন না। তবে উৎসবের দিনে খুব জমকালো পোষাক

পরতেন। রাজকর্মচারী ও সভাসদ্‌দের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন, তাদের সঙ্গে আবার পরিহাসও করতেন। তিনি ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী।

শার্লম্যানের রাজ্য বিস্তারঃ শার্লম্যান বিয়াল্লিশ বছরের রাজত্বে পঞ্চাশ বারেরও বেশী যুদ্ধ করেছিলেন। জার্মানীর **স্যাক্সন** ইটালির **লম্বার্ড** ও পূর্ব-ইউরোপের **অ্যাভারদের** তিনি পরাজিত করেছিলেন। স্পেনের মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি স্পেনের একটা অংশ অধিকার করেছিলেন। এই যুদ্ধের কথা মধ্যযুগের চারণেরা "দি সঙ্গ অব রোলাণ্ড" বা "রেঁালার গীতিকাব্য" লিখে গেছেন। শত্রুদের জয় করে তিনি যখন ফিরে আসছিলেন তখন পিরিনিস পাহাড়ের এক গিরিপথে শত্রুরা আবার তাঁকে আক্রমণ করে। এই সময় শার্লম্যানের দুই অনুচর ও বন্ধু "অলিভার" এবং "রেঁালা" বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুদের হাতে মারা যান। এঁদের মৃত্যুর করুণ গল্প নিয়েই রেঁালার গীতিকাব্য লেখা হয়েছে।

স্যাক্সনদের জয় করতে শার্লম্যানকে খুবই বেগ পেতে হয়। তারা সহজে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেনি। সুবিধা পেলেই বিদ্রোহ করত। একবার তিনি চার হাজার স্যাক্সনকে হত্যা করেন। বন্দী স্যাক্সনদের হাত কেটে দেওয়া হয়। শেষে স্যাক্সননেতা **উইটকিড** দলবল সহ খৃস্টান হন। শার্লম্যান তাদের নিজের রাজ্যে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। তাদের উন্নতির জন্যে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন।

শার্লম্যানের রাজ্য পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, পূর্বে এল্‌ব, ওডার ও ড্যানিয়ূব নদী, উত্তরে ডেন রাজ্যের সীমা এবং দক্ষিণে উত্তর স্পেন ও মধ্য ইটালি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট সাম্রাজ্যে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেক পথ, ঘাট ও গির্জা তৈরি করেছিলেন। জলাভূমি পরিষ্কার করিয়ে ও জঙ্গল কাটিয়ে জমি উদ্ধার করেছিলেন, যাতে কৃষির উন্নতি হয়। বাণিজ্যের জন্যে রাইন থেকে ড্যানিয়ুব নদী পর্যন্ত একটা খাল কাটাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর

শার্লমানের সাম্রাজ্য
ইংল্যাণ্ড
হামবুর্গ
সক্সিনু (সাক্সনী)
অস্ট্রে সিয়া (জার্মেনী)
পোল (পোল্যাণ্ড)
প্যারিস
আকেন
লোয়ার নং
নিউস্ট্রিয়া (ফ্র্যান্স)
বার্গাণ্ডি
আভার
তুলোঁ
কার্ডোভার ইস্‌লাম রাষ্ট্র (স্পেন)
ড্যানিয়ুব নং
বুলগার (বুলগেরিয়া)
সার্ব (সর্বিয়া)
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
রোম
ভূমধ্য
পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য
আফ্রিকা
খলিফার সাম্রাজ্য
উঃ
দঃ
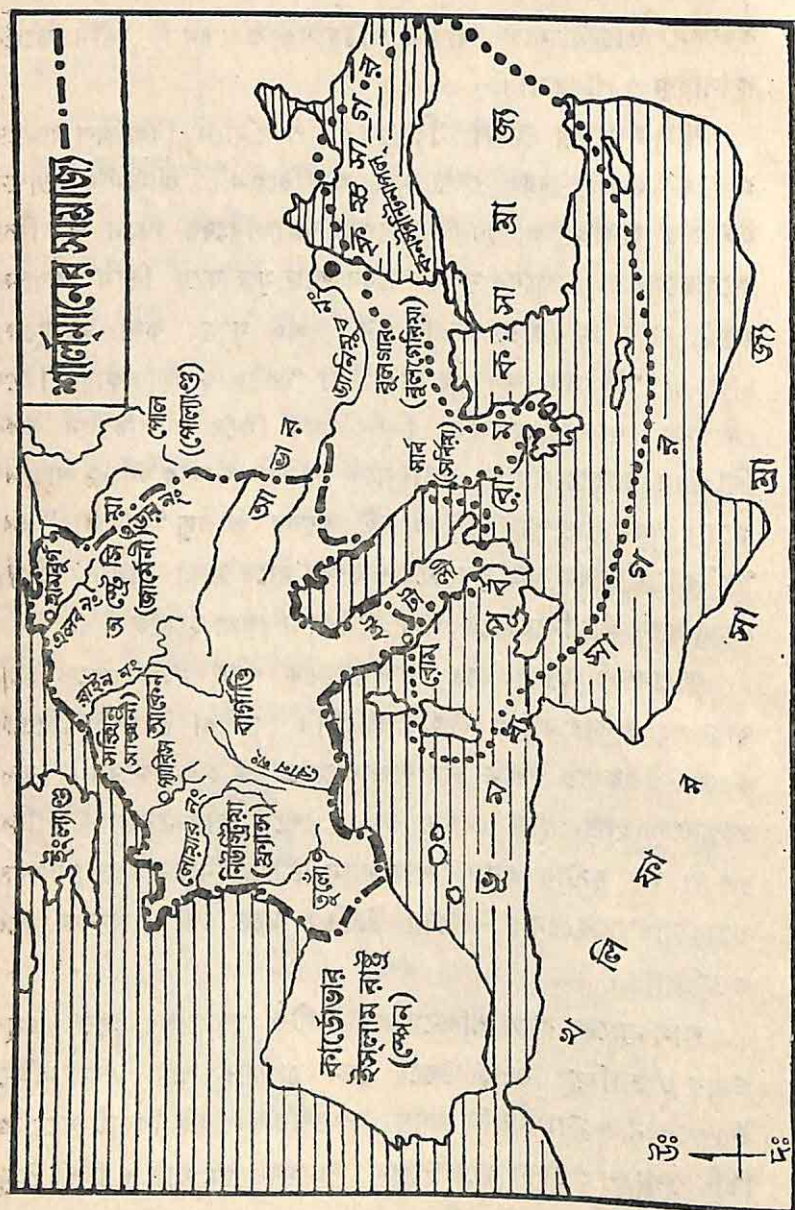
খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল্-রশীদ তাঁর সভায় দূত পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ | পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য

খৃস্টান জগতের ধর্মগুরু ছিলেন পোপ। তিনি রোমে থাকতেন। সেকালে ইউরোপের সব রাজারাই এমন কি সাধারণ মানুষেও তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করত। প্রথম দিকে শার্লম্যানের সঙ্গে পোপের বনিবনা ছিল না। কিন্তু একবার লম্বার্ডি'র রাজা পোপের রোম আক্রমন করেন। পোপ শার্লম্যানের খ্যাতি ও বীরত্বের কথা আগেই শুনেছিলেন। তিনি শার্লম্যানের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেন। শার্লম্যান ইটালিতে গিয়ে পোপের শত্রুদের তাড়িয়ে দেন। পোপের রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। পোপ তাঁর রাজ্যে আবার প্রতিষ্ঠিত হন। ইটালির অনেক অংশ এই সুযোগে শার্ল-ম্যানের অধিকারে আসে।

৮০০ খৃস্টাব্দ শার্লম্যানের জীবনে স্মরণীয়। এর কিছুদিন আগে পোপের অনুরোধে সম্রাট রোমে যান। বড়দিনের দিন অন্যান্য সবাইকার মত শার্লম্যানও সেন্ট পিটারের গির্জায় উপাসনা করতে যান। শার্লম্যান যখন উপাসনা শেষ করে উঠতে যাবেন তখন পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় প্রাচীন রোম-সম্রাটদের রাজমুকুট পরিয়ে দেন। তিনি সিজার অগস্টাস্ নামে পরিচিত হন। সমবেত জনতা 'পবিত্র রোম সম্রাট শার্লম্যানে'র জয়ধ্বনি করে ওঠে। সেদিন হতে সৃষ্টি হয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। প্রায় তিন'শ বছর পরে আবার রোম সাম্রাজ্যের উদয় হল বলে মনে হয়। শার্লম্যান কন্স্টান্টিনোপলের সম্রাজ্ঞী আইরিনকে বিয়ে করে পূর্ব ও পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য দুটোকে এক করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু

পোপ তাঁকে "পবিত্র রোম সম্রাট" উপাধি নিতে বাধ্য করায় সাম্রাজ্য দুটো আলাদা থেকে গেল। বাইজ্যাণ্টাইনের চার্চও রোমের চার্চ থেকে আলাদা হয়ে রইল।

পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। এটা পবিত্রও নয়, সাম্রাজ্যও নয় এবং চরিত্রের দিক থেকে রোমানও নয়। কারণ শার্লম্যান ছিলেন ফ্রাঙ্কদের রাজা। তিনি ফ্রাঙ্কদের রাজাই থেকে গেলেন। কেবল একটা নতুন উপাধি পেলেন। আয়তনেও এটা রোমান সাম্রাজ্য ছিল না। একে একটা বড় জার্মান রাজ্য ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তবে এর গুরুত্ব এই যে, ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে এর মধ্য দিয়ে চেষ্টা করা হয়।

সম্রাট ও পোপ: শার্লম্যানের পর যাঁরা সম্রাট হলেন তাঁদের সঙ্গে রোমের পোপের খৃস্টান জগতের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রায় ঝগড়া হত। সম্রাট ও পোপ দুজনেই ছিলেন পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি। সম্রাট ছিলেন রাজনৈতিক ব্যাপারে কর্তা, আর পোপ ছিলেন ধর্মের ব্যাপারে কর্তা। কিন্তু কে বড় কে ছোট, এই নিয়ে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে অনেক দিন ধরে ঝগড়া চলেছিল।

তৃতীয় পাঠ | শার্লম্যানের শিল্পপ্রীতি ও শিক্ষানুরাগ

শিল্পপ্রীতি: শার্লম্যান মধ্যযুগের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। পোপের দ্বারা সম্রাট পদে অভিষেকের পর তিনি নিজেকে প্রাচীন রোমের সম্রাটদের উত্তরাধিকারী মনে করতেন। সেইজন্যে তিনি প্রাচীন রোমের হারানো গৌরব উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। রাইন নদীর তীরে তিনি অ্যাকেন নগরে তাঁর রাজধানী বসান। এই নগরের নাম দেন নূতন রোম। রোম

নগরের অনুকরণে তিনি তাঁর রাজধানীকে সুন্দর করে সাজিয়ে ছিলেন। বড় বড় শিল্পী ও কারিগর আনিয়ে গির্জা তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল সেকালের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইটালির র‍্যভেনা নামে রাজপ্রাসাদ থেকে মোজেক তুলে এনে তিনি নিজের রাজপ্রাসাদ সাজিয়ে ছিলেন। অ্যাকেন শহরে তিনি একটা গির্জা তৈরী করান এবং হল্যাণ্ডের কাছে দুটো প্রাসাদও তৈরি করান। রাইন নদীর উপর একটা পুলও তৈরি করিয়েছিলেন।

শিক্ষানুরাগঃ—শার্লম্যান নিজে শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি জ্ঞানির আদর করতেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষাই মানুষের জীবনের সবকিছু। রাজা হবার পর তিনি লেখাপড়া শিখবার চেষ্টা করেন। শোনা যায় শোবার সময় তিনি বালিশের নীচে লিখবার সরঞ্জাম রাখতেন। খাওয়ার সময় তাঁকে ইতিহাস পড়ে শোনান হত। ল্যাটিন ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। গ্রীকভাষাও তিনি বুঝতে পারতেন। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পণ্ডিত তাঁর দরবারে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের আলকুইন ছিলেন প্রধান। ডেনদের ইংলণ্ড আক্রমণের সময় তিনি শার্লম্যানের দরবারে চলে আসেন। আলকুইনের চেষ্টায় রাজপ্রাসাদেই স্কুল বসে। সেখানে গরীবদের ছেলেরাও পড়তে পারত। বড়লোকদের অলস ছেলেদের ভাগ্যে জুটত বকুনি। ক্লীমেণ্ট নামে এক পণ্ডিতকে তিনি গল দেশে পাঠান। তাঁর কাছে গরীব, বড়লোক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সব শ্রেণীর ছাত্রকেই পাঠান হত। রাজাই এদের খরচ দিতেন। প্রাথমিক শিক্ষার ওপরেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ৭৯৮ খৃস্টাব্দে তিনি পাদ্রীদের আদেশ করেছিলেন তাঁর রাজ্যের গরীব ছেলেদের জড় করে একটা ইস্কুল করতে। এই যুগে নতুন সাহিত্য ও জ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পুরানো বই ইত্যাদি নকল করে সে যুগের পণ্ডিতেরা অনেক অমূল্য বইকে ধ্বংসের

হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। শার্লম্যানের কৃতিত্ব এই যে ইউরোপের ইতিহাসে যখন অন্ধকার যুগ নেমে আসে তখন তিনি সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বেলে রেখেছিলেন।

চতুর্থ পাঠ | মধ্যযুগের মঠ ও বেনিডিক্টের নিয়ম, ক্লানি ও চার্চ

মধ্যযুগে মঠগুলো ছিল ধর্ম ও শিক্ষার কেন্দ্র। দেশের অনেক জায়গাতেই মঠ গড়ে উঠেছিল। যে মঠে মঙ্করা থাকতেন সেগুলো সাধারণতঃ একটা বড় জমির মাঝে তৈরি হত। মঠের উত্তর পাশে গির্জা, দক্ষিণদিকে খাবার ঘর, পশ্চিমদিকে থাকত গুদাম ঘর, আর পূর্বদিকে ছিল মঙ্কদের শোবার ঘর। তখনকার দিনে যাজকেরাই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। সেইজন্যে লোকে তাঁদের খুব সম্মান করত। মানুষের জীবনে ধর্মই ছিল প্রধান।

মঙ্ক ও নান্‌ঃ—যাজকদের মধ্যে একদল ছিলেন সন্ন্যাসী তাঁদের মঙ্ক বলা হত। এঁরা একসঙ্গে মঠে থাকতেন। এই ধরনের মঠকে মনাস্টারি বলা হত। এঁরা ছিলেন আমাদের দেশের বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মত। অ্যাবট্‌ অর্থাৎ মঠাধ্যক্ষের অধীনে মঙ্করা থাকতেন। অ্যাবট্‌ থাকতেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। আশেপাশের সমস্ত গ্রাম ও নগর অ্যাবট্‌কে সম্মান করত। অ্যাবটকে কাজে সাহায্য করার জন্যে প্রায়র থাকতেন। প্রায়রের নীচে এক শ্রেণীর যাজক ছিলেন। সকলের নীচে ছিলেন মঙ্ক।

মঙ্ক

এঁরা মঠের সেবা করতেন, সারাদিন পরিশ্রম করতেন, ও অবসর সময়ে উপাসনা করতেন। পুরুষদের মঠকে

অ্যাবি বলা হত। স্ত্রীলোকেরাও ইচ্ছে করলে সন্ন্যাসিনী হতে পারতেন। তাঁদের নান্ বলা হত। তাঁদের মঠের নাম ছিল নানারি। অ্যাবেস্ ছিলেন নানারির অধ্যক্ষা। প্রত্যেক মঠেরই নিজস্ব নিয়ম ছিল। অ্যাবট্ বা অ্যাবেস্ সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। মঙ্ক ও নান্‌দের কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হত।

মঙ্কদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁদের ফ্রায়ার বলা হত। তাঁরা লোকালয়ে গিয়ে জনসাধারণের সেবা করতেন। এঁরা খুবই পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন। ভিক্ষা করে গরিবদের সাহায্য করতেন, লোককে ধর্মোপদেশ দিতেন, এবং রুগীর সেবা করতেন। এঁদের বিভিন্ন দল ও ভ্রাতৃসঙ্ঘ ছিল। সোলজার প্রিস্ট নামে একদল সন্ন্যাসী ছিলেন যাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেবাশুশ্রূষা করতেন। এছাড়াও ফাইটিং মঙ্ক নামে একদল সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁরা ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতেন।

বেনিডিক্টের নিয়ম :—ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক মঙ্ক ছিলেন। মঙ্কদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতির জন্যে অনেক কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম করার প্রয়োজন দেখা দিল। সেণ্ট বেনিডিক্ট এই কারণে মঙ্কদের জন্যে কতকগুলো নিয়ম বেঁধে দেন। বেনিডিক্ট ছিলেন মণ্টিক্যাসিনো নামে একটা মঠের প্রধান। তিনি তাঁর মঠের জন্যে কতকগুলো নিয়ম করেন। সেই নিয়মগুলো অন্যান্য মঠও চালু করে দেয়। প্রত্যেক মঠে একজন অ্যাবট্ থাকতেন। মঠবাসীরাই তাঁকে নির্বাচন করবে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলবে। মঙ্ক হবার আগে একজনকে শিক্ষানবিশি করে প্রমাণ করতে হবে যে সে মঙ্ক হবার যোগ্য। সব মঙ্ককে দরিদ্র জীবন যাপন করতে, এবং দানশীলতা ও আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। কেউ জীবনে বিয়ে করতে পারবে না এবং নিজের কোন ধনসম্পত্তি রাখতে পারবে না। কোন মঙ্কই অলসভাবে জীবন কাটাতে পারবে না। উপাসনা ছাড়াও একজন মঙ্ককে আরও কতকগুলো কাজ করতে হবে, মঠের রান্না ও সাফাইয়ের কাজ এবং মঠের পাশের জমিতে চাষ আবাদের কাজ

চলত। এসব করা ছাড়াও মঙ্ককে নিজে পড়তে হত ও পড়াতে হত। তারা পুঁথিপত্র নকল করার কাজও করত। একজন মঙ্ককে দিনের মধ্যে সাতটা কাজ করতে হত। এইসব নিয়ম মানার ফলে মঠগুলো স্ব-নির্ভর হয়ে উঠেছিল।

ক্লানি ও চার্চ :—মধ্যযুগে মঠগুলোর অনেক সম্পত্তি থাকত। এইসব সম্পত্তি নানাভাবেই বাড়ত। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার মঠে টাকাকড়ি দিতেন। কেউ আবার মারা যাবার সময় তাঁর সম্পত্তি মঠকে দান করে যেতেন। রাজা বা জমিদারেরা অনেক সময় মঠকে কিছু জমি জায়গা দান করতেন। মঙ্কদের পরিশ্রমের ফলে মঠ-গুলোর সম্পত্তি দিন দিন বাড়তে থাকে, মঠবাসীদের জীবনে আসে সুখ ও আরাম। তারা নিজেদের আদর্শ ভুলে বিলাসী হয়ে পড়েন। এক সময় যারা সরল ও সাধু জীবন যাপন করত তাদের মধ্যে দুর্নীতি দেখা দিল। অর্থাৎ এক কথায় তারা বেনিডিক্টের নিয়ম এবং আদর্শ ভুলে গেল। মঠগুলোর অবনতি হতে লাগল। মঠগুলো বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মেতে উঠল। তাছাড়া ক্ষমতা ও সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় যাজকদল এক একজন সামন্ত প্রভু হয়ে ওঠেন। তাঁরা মঠে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছিলেন। মঠগুলোকে বাঁচাতে হলে মঠের জীবনে নতুন করে সংস্কার করার দরকার হয়ে পড়ল। একাদশ শতাব্দীতে ক্লানি (cluny) নামে এক মঙ্ক মঠের জন্যে কতকগুলো নিয়ম করেন। তারই ফলে মঠগুলোতে আবার নৈতিক এবং মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়। ক্লানি সংস্কারের মধ্য দিয়ে মঠগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান।

পঞ্চম পাঠ

প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব
(ইন্‌ভেস্টিচার কন্‌টেস্ট)

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রোমের অবস্থা বর্ণনা করা খুবই শক্ত। শার্লম্যানের পর পোপকে রক্ষা করবার জন্যে কেউ ছিলেন না। দক্ষিণ ইটালি থেকে মুসলমান আক্রমণের ভয় ছিল। রোমের ক্ষমতাবান লোকেরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মত পোপ বানাত। ফলে অনেক বাজে লোকও পোপ হয়েছিলেন। এই রকম একজন পোপ ছিলেন দ্বাদশ জন। তিনি স্যাক্সনদের রাজা অটোকে ইটালিতে নিমন্ত্রণ করে এনে ছিলেন। ৯৬২ খৃস্টাব্দে অটো সম্রাট হয়ে বসলেন। তিনি ইটালিতে যে নজীর গড়ে তুললেন সেটা তাঁর পরের রাজাদের মধ্যেও দেখা যায়। পোপ এবং রাজাদের মধ্যে কে কার উপর কর্তৃত্ব করবেন এই নিয়ে ঝগড়া দেখা দেয়। এর ফলে সম্রাটের মান সম্মান অনেক কমে যায়। বিশপ এবং অ্যাবটেরা ছিলেন এক একজন সামন্ত-প্রভু। যাজক এবং মঠ-বাসীদের দ্বারা তাঁরা নির্বাচিত হতেন। এই ছিল প্রথা। কিন্তু কাজে তা হত না রাজা এবং বড় বড় সামন্ত প্রভুদের পছন্দ মত কাউকে নির্বাচন করা না হলে তাঁরা মঠকে জমি দিতেন না। বিশপকেও তাদের অনুগত থাকতে হত। কিন্তু অনেক সময় বিশপ বা অ্যাবট এই অনুগত থাকা অসম্মানের কাজ মনে করতেন। কারণ এমন অনেক সামন্তপ্রভু বা রাজা ছিলেন যাঁরা ছিলেন খুবই খারাপ লোক। ধর্ম তাঁদের কাছে কেবল মাত্র ছেলে খেলার বিষয় ছিল। সেইজন্যে অনেক বিশপ বা অ্যাবট মনে করতেন চার্চের নিজস্ব অধিকার আছে কাজ করার। অন্যদিকে রাজা এবং সামন্ত প্রভুরা ভাবতেন চার্চের অনেক ধন সম্পত্তি আছে। যাজকদলের হাতে অনেক অর্থ থাকলে তাঁরা বিদ্রোহ করতে পারেন। ফলে এই নিয়ে পোপ এবং রাজাও সামন্ত প্রভুদের মধ্যে কে বড় কে কার কথা শুনবে এই নিয়ে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব (ইন্‌ভেস্টিচার কন্‌টেস্ট) দেখা দেয়। এই ঝগড়ার মীমাংসা একমাত্র আপসেই হতে পারে।

ষষ্ঠ পাঠ

শিক্ষা বিস্তারে মঠের অবদান, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রজীবন ও ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক

ইউরোপের ইতিহাসে মঠ ও মঙ্কদের প্রভাব খুবই পড়েছিল। মঙ্কদের পরিশ্রমের ফলে মঠগুলো হয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। যখন সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার কোন দাম ছিল না তখনই মঠগুলো শিক্ষাপ্রসারের কাজে ব্যস্ত ছিল। অশিক্ষিত লোকদের লেখাপড়া শেখাত। মঠবাসীরা সাধ্যমত চেষ্টা করতেন শিক্ষা ও শিল্প কলার আলো জ্বেলে রাখতে। অনেক মঙ্ক এই ব্যাপারে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে মনীষী বীডে্র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি চার্চের ওপর একটা বই লেখেন। এই বই থেকে ইউরোপের সেসময়কার ইতিহাস জানা যায়। তাছাড়া তিনি জারো-তে একটা আশ্রম করেছিলেন। সেখানে দেশ বিদেশের অনেক জ্ঞানী ও ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞানচর্চা করতেন। তিনি মঙ্কদের দিয়ে অনেক পুঁথিও নকল করিয়ে ছিলেন। মঠ গুলোতে শান্তি এবং নিয়ম শৃঙ্খলা থাকায় সেখানে সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হত। লোকের মনে শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা দেয়। কতকগুলো বড় বড় মঠ ও গির্জা সে সময়ে বিদ্যা-চর্চার জন্যে খ্যাতি লাভ করে। এই ভাবে মঠগুলো বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পরে এই বিদ্যালয় গুলোকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—এই সব বিদ্যালয়ে সব বিষয়ে পড়ার সুযোগ হত না। দ্বাদশ শতাব্দীতে মঠ ও গির্জার সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয় গুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছিল। কোন বিখ্যাত জ্ঞানী বা শিক্ষকের নাম শুনে দূর দেশ থেকে ছাত্রেরা তাঁর কাছে পাঠ নিতে আসত। অনেক সময় নাম করা শিক্ষকেরা এক

জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ভ্রাম্যমান শিক্ষক ও ছাত্রদল এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থা। মোট কথা ছাত্র এবং শিক্ষকদের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। এইসব বিদ্যালয়ে দেশ বিদেশের সব ছাত্রেরাই শিক্ষালাভ করতে পারত বলে এগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হত। কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা শাখার চর্চা হত। তখন ছাত্র এবং শিক্ষককেরা এক জাগাতেই বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের দেখে আরও ছাত্র ও শিক্ষককেরা এলেন। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ে ও তাদের প্রসার হয়।

বোলোনার আইন ছাত্রেরা তাদের পড়াশুনার জন্যে অধ্যাপক নিযুক্ত করে। গড়ে ওঠে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়। প্যারীর শিক্ষকদের খ্যাতি শুনে সেখানে অনেক ছাত্র এসে জুটে ছিল। গড়ে উঠেছিল প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়। বোহেমিয়ার প্রাগ্ শহর থেকে শিক্ষক ও ছাত্রেরা জার্মানির লাইপজিগে গিয়ে লাইপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলে। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে সেকালে দুটো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ইটালির স্যালার্নো ছিল আর একটা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।

পঠন পাঠনের বিষয় :—বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানোর জন্যে খ্যাতি ছিল। দক্ষিণ ইটালির স্যালার্নো চিকিৎসা বিদ্যার জন্যে, উত্তর ইটালির বোলোনা আইন ফ্রান্সের প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষাদানের জন্যে খ্যাতি ছিল। তবে বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের রচনা খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও রোমান আইন পড়ানো হত। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা হত।

ছাত্রজীবন ও ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক :—মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো এখনকার মত ছিল না। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

পরিচালনা করতেন, আবার কোথাও বা ছাত্ররাই কর্তৃত্ব করত। যাতায়াতের সুবিধা না থাকায় ছাত্রেরা শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দল বেঁধে একটা বাড়ীতে থাকত। ছাপা বই ছিল না। অধ্যাপকেরা বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রেরা শুনে শুনে যেটুকু লিখে নিত তার ওপর নির্ভর করত। ভোর ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত ছাত্রেরা অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনত। তারপর অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। চামড়ার ওপর লেখা কিছু পুঁথি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা হত। কিন্তু সেগুলো সংখ্যায় খুবই কম ছিল।

তখনকার শহরগুলোতে বিদেশীদের কোনরকম সুবিধা দেওয়া হত না। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশ থেকে ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা আসত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছাত্র এবং শিক্ষকেরা পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যে সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। এগুলোকে নেশন্‌স্ (Nations) বলা হত। বিভিন্ন নেশন্‌সের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। ছাত্রদের সঙ্গে নাগরিকদেরও মাঝে মাঝে ঝগড়া লাগত। এই জন্যে অনেক সময় ছাত্র শিক্ষকদের শহরের বাইরে বের করে দেওয়া হত। এই গণ্ডগোলকে টাউন ও গাউনের বিবাদ বলা হত। কারণ ছাত্রদের পোষাক ছিল গাউন।

পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী ছাত্রদের ভাগ করা হত। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাহিত্য, কলা, আইন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সঙ্গীত, ন্যায় ও অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। পাঁচ বছরের পরে পাঠ শেষ হলে ছাত্রেরা ডিগ্রী পেত। তারপর কোন ছাত্র যদি আরও তিন বছর পড়াশুনা করত তবে সে মাস্টার-অফ্-আর্টস" উপাধি পেত।

ছাত্রদের বেতনের উপর শিক্ষকদের নির্ভর করতে হত। ছাত্রসংখ্যা কমলে শিক্ষকদের আয়ও কমে যেত। গরীব ছাত্র এবং গরীব অধ্যাপকদের অবস্থা প্রায় সমান ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রভু-শিল্পী ও শিক্ষার্থী-শিল্পীর মত ছিল। এক কথায় ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল।

সপ্তম পাঠ | মধ্যযুগের পাণ্ডিত্য

মধ্যযুগের একদল পণ্ডিতকে "স্কুল-মেন" বা "স্কলাস্টিক" বলা হত। তাঁদের বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁরা যুক্তি দিয়ে সব বোঝাতে চেষ্টা করতেন। পরে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার সৃষ্টি হয়। এই সকল মনীষীদের মধ্যে ফ্রান্সের পিটার অ্যাবেলার্ড জার্মানীর এলবার্টস্ ম্যাগনাস, ইটালির টমাস অ্যাকুইনাস ও ইংলণ্ডের রজার বেকন প্রভৃতি বিখ্যাত।

পিটার অ্যাবেলার্ড একাদশ শতাব্দীর দিকে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। এমনকি ধর্মের ব্যাপারেও তিনি যুক্তি মেনে চলবার নির্দেশ দিতেন। শোনা যায় তাঁর বক্তৃতা শুনতে রোজ প্রায় তিন হাজার ছাত্র জড়ো হত। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্যারীর বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম "হাঁ ও না"। তাঁর দুই প্রধান শিষ্যের নাম পিটার লম্বাডিও ও আর্ণলড।

এলবার্টাস ম্যাগনাস প্রাচীন গ্রীকদের জ্ঞান ও দর্শন এবং অ্যারিস্টটলের উপদেশের খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করে খৃস্টধর্মের ওপর একটা বই লেখেন। টমাস অ্যাকুইনাস্ ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য। এলবার্টাস প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন।

টমাস অ্যাকুইনাস ইটালির নেপলস্ শহরে জন্মেছিলেন। তিনি ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব পাঠ করেন এবং সে সময়ের সবচেয়ে বিদ্বান বলে পরিচিত হন। তিনি মধ্যযুগের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর একখানা বই লেখে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

রজার বেকনকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তিনি একাদশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। বলবিদ্যা, রসায়ন, আলোক বিজ্ঞান,

পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। প্রাণী ছাড়া মাটিতে গাড়ী চলবে এবং আকাশে মানুষ পাখীর মত উড়বে—একথা তিনি তখন বলেছিলেন।

এই সময় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বেশ উন্নতি হয়েছিল। দান্তে, চসার প্রভৃতি কবি ও লেখক এই যুগের সাহিত্যকে খুবই উন্নত করেছিলেন। দান্তের "ডিভাইন কমেডি" ও চসারের "ক্যান্টারব্যরি টেলস্" বিখ্যাত রচনা।

অষ্টম পাঠ | শিল্প কলা

মধ্যযুগের আর একটি কীর্তি হচ্ছে সে যুগের শিল্প। এই সময়কার শিল্পরীতিতে নতুন রূপ দেখা যায়। বড় বড় বাড়ি, গির্জা ও রাজপ্রাসাদ তৈরির ব্যাপারে শিল্পীরা তাঁদের দক্ষতা দেখিয়েছেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত গির্জা তৈরি হত রোমান রীতিতে। এইজন্যে এই রীতির নাম ছিল রোমানেস্ক। এই রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল বড় বড় গোলাকার খিলান, মোটা মোটা থাম ও খুব পুরু আর চওড়া দেওয়াল। কিন্তু এই পুরানো ধারা পালটিয়ে নতুন ধারায় গির্জা তৈরি আরম্ভ হল। এই নতুন ধারাকে গথিক রীতি বলা হল। সুন্দর চূড়া, ছুঁচালো তোরণ, খিলানের ছাদ আর বিশেষ কায়দায় তৈরি রঙীন কাঁচের জানালা এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য। এর নাম "গথিক" শিল্প হলেও গথদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে ইটালির লোকেরা সব জার্মানকেই "গথ" বলত। সেই জন্যে জার্মান স্থাপত্য শিল্প "গথিক" নামে পরিচিত হয়েছে।

এই সময় যে সব গির্জা তৈরি হয় সেগুলো তাদের সৌন্দর্যের জন্যে

বিখ্যাত। গির্জাগুলোর জানালায় রঙীন কাচের সার্সি লাগানো হত। এই রকম রঙীন কাচকে স্টেন্ড্ গ্লাস বলা হয়। রঙীন কাঁচগুলোর ওপর যীশু এবং খৃস্টান মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনা নিয়ে ছবি আঁকা হত। ভারী কাঁচকে সীসা দিয়ে জোড়া লাগান হত। আলো পড়লে কাঁচগুলো ঝকঝক করত। ইউরোপের বড় বড় শহরে গথিক রীতির অনেক বড় বড় প্রাসাদ ও গির্জা দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে রিম্‌সের গির্জা, প্যারীর নোত্‌রদামের গির্জা, কোলোনের গির্জা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কলকাতার হাইকোর্ট হয়ত অনেকে দেখেছ। ওটা গথিক রীতিতে তৈরি হয়েছে।
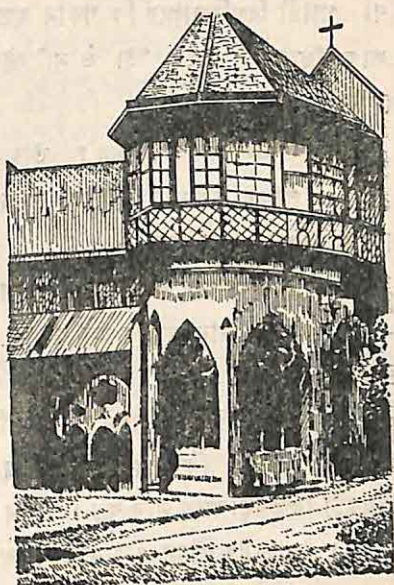
রিমসের গির্জা

অনুশীলনী

১। **দু এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) কে স্পেনের মুসলমানদের আক্রমণ রোধ করেন ? (খ) শার্লম্যানের বাবার নাম কি ? (গ) এগিনহার্ড কে ছিলেন ? (ঘ) রোঁলার গীতিকাব্য কারা লিখেছিলেন ? (ঙ) উইটকিণ্ড কে ছিলেন ? (চ) পোপ কাকে বলা হয় ? (ছ) আইরিনি কে ছিলেন ? (জ) অ্যাকেন নগরের কি নাম দেওয়া হয় ? (ঝ) আল্‌কুইন কে ছিলেন ? (ঞ) মনাটারি কাকে

বলা হত? (ট) অ্যাবি কি ? (ঠ) নানারি কাকে বলা হয় ? (ড) জারোতে কে আশ্রম তৈরি করেছিলেন ? (ঢ) সালার্নো কোথায় ? (ণ) প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়ান হত? (ত) রজার বেকন কোথাকার লোক ছিলেন? (থ) "হ্যাঁ ও না" বইয়ের লেখক কে ? (দ) দান্তের লেখা বইটির নাম কি ?

২। শার্লম্যান কে ছিলেন? তাঁর রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা দাও।

৩। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য কবে থেকে হয়েছিল? পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে যাহা জান বল।

৪। শার্লম্যানের শিক্ষানুরাগ বিষয়ে কি জান ?

৫। মঙ্ক ও নান্ কাদের বলা হয়? তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করতেন তাহার বর্ণনা দাও।

৬। বেনিডিক্ট কে ছিলেন? তাঁর নিয়মগুলি কি ছিল ?

৭। মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা দাও। কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর। পঠন পাঠনের বিষয় কি ছিল?

৮। ছাত্রদের জীবন এবং ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

৯। মধ্যযুগের কয়েকজন পণ্ডিতদের নাম কর। তাঁদের মধ্যে যে কোনও দুজনের বিষয় আলোচনা কর।

১০। রোমানেস্ক ও গথিক শিল্প বলতে কি বোঝ? গথিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি ?

১১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) 'চার্লস্-দি-গ্রেট কথার ফরাসীরূপ —।

(খ) শার্লম্যানের সভায় — — — দূত পাঠিয়েছিলেন।

(গ) পুরুষদের মঠকে — বলা হত।

(ঘ) — — ধর্মযুদ্ধে অংশনিতেন।

(ঙ) — খৃষ্টাব্দে অটো ইটালির সম্রাট হয়ে বসেন।

(চ) সালার্নো বিশ্ববিদ্যা য় ছিল — —।

(ছ) পিটার আবেলার্ড ছিলেন --।

(জ) — — কে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয়।

(ঝ) চসারের বিখ্যাত রচনা — —।

১২। পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত নামগুলি একত্রিত কর :—

১। অলিভার	(ক) ইটালি।
২। আইরিনি	(খ) সেন্ট-বেনিডিক্ট।
৩। অ্যাকেন	(গ) নেপলস্।
৪। র‍্যাভেনা	(ঘ) ডিভাইন কমেডি়।
৫। আলকুইন	(ঙ) রোঁলার গীতিকাব্য।
৬। মন্টিক্যাসিনো	(চ) স্যাক্সন।
৭। অটো	(ছ) কন্‌স্টান্টিনোপল।
৮। টমাস অ্যাকুইনাস	(জ) জারা।
৯। দান্তে	(ঝ) নতুন রোম।
১০। বীড্	(ঞ) ইংলণ্ড।

সপ্তম অধ্যায়
প্রথম পাঠ

মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু মানুষের মন থেকে সভ্যজীবনের ধারণা একেবারে মুছে যায় নি। বাংলাদেশে পালযুগের আগে যেমন অরাজকতা চলছিল পশ্চিম ইউরোপের অবস্থা তখন ছিল অনেকটা সেই রকম। সমাজে মানুষ ছিল একা, একেবারেই অসহায়। ক্ষমতাবান লোকেরা সবকিছুই দখল করে নিত। আবার তাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতা-শালী লোকেরা এসে তাদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই ঐ সমস্ত দখল করে বসত। ক্ষমতাশালী এবং জমিদার শ্রেণীর লোকেরা নানা জায়গায় দুর্গ তৈরী করেছিল। মাঝে মাঝে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা অন্যগ্রামে গিয়ে লুঠপাট করত। ফলে কৃষক ও শ্রমিকেরা খুবই অসহায় বোধ করত। এই গোলমালের অবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল সামন্তপ্রথা বা ভূম্যধিকার পদ্ধতি।

কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। এদের রক্ষা করার জন্যে কোন শক্তিশালী সরকারও ছিল না। তখন তারা অত্যাচারী দুর্গের মালিকদের সঙ্গে নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করে নিল। কৃষকেরা ঠিক করল উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ তারা দুর্গ-মালিকদের দেবে এবং কোন কোন ব্যাপারে তাদের অনুগত থাকবে। দুর্গের মালিকও তাদের আপদে বিপদে রক্ষা করতে রাজী হল। ছোট আর বড় দুর্গ-মালিকের মধ্যেও এমনি ধরণের বোঝাপড়া হল। তবে ছোট দুর্গের মালিক চাষ করত না। সেইজন্যে ঠিক হল যুদ্ধের সময় সে বড় দুর্গের মালিককে সাহায্য করবে। এইভাবে ক্ষমতাটা চাষী থেকে দুর্গের মালিক ও দুর্গের মালিক থেকে রাজা পর্যন্ত পৌঁছাল।

ক্রমে ইউরোপে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই দাঁড়িয়ে গেল।

বস্তুত তখন কোন কেন্দ্রীয় সরকার এবং পুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। জমির মালিকই ছিল সর্বেসর্বা, শাসনকর্তা। তার জমিতে যারা বাস করত তাদের উপরে তারই আধিপত্য, তাদের রক্ষা করার দায় ও তারই।

যেখানেই সামন্ততন্ত্র চালু হয়েছিল সেখানেই আগেকার শাসনতন্ত্র এবং স্থানীয় আইনের পরিবর্তন হয়ে যায়। নতুন আইনের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে আইনকে ঠিক জাতীয় আইন বলা চলে না। এই ধরণের আইনের ফলে সমৃদ্ধি ও দেশের অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। বর্বরদের আক্রমণের ফলে রোমান আইনের ছিটে-ফোঁটা যাও বা ছিল সামন্তপ্রথার যুগে তাও একেবারেই লোপ পেয়ে গেল। দেশে সব জায়গাতেই স্বৈরতন্ত্র দেখা দিল।

দ্বিতীয় পাঠ | ভূমির সহিত সামন্ত প্রথার সম্পর্ক

ভূমি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই সামন্ত প্রথা গড়ে ওঠেছিল। এই ব্যবস্থা বুঝতে হলে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিষয়টা বুঝতে হবে। আইনত রাজা ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। তিনি সমস্ত জমি তাঁর বড় বড় অনুচরদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তাঁরা হতেন রাজার সামন্ত, আর রাজা হতেন সামন্তদের প্রভু। এইভাবে যে জমি দেওয়া হত তাকে ফিফ (Fief) বা ফিউড (Feud) বলা হয়। সেইজন্যে এই ব্যবস্থাকে ফিউডালিজম (Feudalism) বলে। এই ব্যবস্থাকে আমরা সামন্ততন্ত্র বলতে পারি। রাজা যেমন সামন্তকে জমি দিতেন সামন্তেরাও তেমনি তাঁদের অনুচরদের মধ্যে কতকগুলো শর্তে জমি ভাগ করে দিতেন। এইভাবে সামন্তেরা চাষীদের প্রভু হতেন। সমাজ একটা পিরামিডের মত ছিল। পিরামিড গড়ে উঠল যার ভিত ছিল কৃষক আর চূড়ো ছিলেন রাজা।

এই জমির পরিবর্তে সামন্তদের প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করতে হত ও তাঁকে সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। প্রভুর সামনে নতজানু হয়ে প্রভুর হাতের মধ্যে হাত রেখে অনুগত থাকার ও সেবার শপথ নিতে হত। সামরিক কাজ এই সেবার প্রধান অঙ্গ ছিল। এই হচ্ছে সামন্ততন্ত্র ও তার ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সামন্ততন্ত্রে দুটো ধারণা বদ্ধমূল ছিল, যথা (১) উচ্চ বংশের বা সম্ভ্রান্ত মানুষের চেয়ে নীচু তলার মানুষের ওপর কিছু অধিকার আছে। (২) যারা নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাদের উঁচুশ্রেণীর মানুষের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে। কার কতটা জমি আছে তার ওপর নির্ভর করে এই অধিকার এবং কর্তব্য ঠিক হত।

যে ফিফ বা জমি দেওয়া হত সেগুলো বংশ-পরম্পরায় ভোগ করত। কোন সামন্ত বা তাঁর বংশধরেরা সেই ফিফ ফিরিয়ে নিতে পারত না, যতদিন সামন্তের জমিভোগকারীরা তাদের শর্ত মেনে চলত।

তৃতীয় পাঠ | সামন্তযুগে যাজক সম্প্রদায়ের শাসন

সামন্ততন্ত্র যে কেবল সমাজের মধ্যে চালু ছিল তা নয়, এই ব্যবস্থা চার্চগুলোর মধ্যেও চলত। কারণ লোকে মনে করত স্বর্গেও এই ব্যবস্থা রয়েছে যার সর্বময় কর্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। যাজক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থের জন্যেই এইকথা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছিলেন। কারণ বিশপ ধর্মযাজক প্রভৃতি ধর্মীয় নেতারাও এক একজন সামন্ত ছিলেন। বিশপ বা বড় বড় যাজকদের অনেক বিষয় সম্পত্তি থাকত। পুরোহিতদের মধ্যে বিশপই ছিলেন প্রধান। বিশপের জমিদারিকে বলা হত "ডায়োসিজ"। লোকে এইসময় ছিল ধর্মভীরু। তাদেরকে ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে বিশপেরা তাদের

প্রাধান্য মানতে বাধ্য করত। এমনকি জমিদার ও রাজারাও অনেক সময় বিশপদের কথায় চলতেন। কারণ সে সময়ে যাজকেরাই ছিলেন সমাজের একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। সব যাজকেরাই যে ভদ্র এবং সৎছিলেন তা নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি বাড়িয়ে এদের মধ্যে বেশীর ভাগ হয়েছিলেন সামন্তপ্রভু। চার্চের মধ্যেও তাঁরা এই সামন্ততন্ত্র চালু করেছিলেন। তবে কখনও কখনও ছোটখাটো যাজকেরা চাষীদের পক্ষে থাকতেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁরা বিশপদের পক্ষই সমর্থন করতেন। আর ওটা করাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ বিশপেরা ছিলেন এক একজন সামন্তপ্রভু।

চার্চগুলো বিশপদের অধীনে একটা রাজ্যের মধ্যে আর একটা রাজ্য হয়ে উঠল। যাজক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব আইন কানুন চালু করলেন। রাজা এবং সামন্তদের উৎপাত ছিল। তার সঙ্গে যোগহত যাজকদলের উৎপাত। সব জায়গায় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র দেখা দিল। রাজার মত পুরোহিত গোষ্ঠীকেও মনে করা হত ঈশ্বরের ছায়া। স্বর্গমর্ত দুইই সামন্ত প্রথার মধ্যে এসে গেল।

চতুর্থ পাঠ | নাইট ও নাইটদের জীবন

সেকালে বড় বড় দুর্গ প্রাসাদ ছিল। এই সুরক্ষিত দুর্গে নাইট ও সামন্তেরা থাকতেন। সামরিক শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেওয়া হত। প্রথম জীবনে সম্ভ্রান্তবংশের ছেলেরা কোন বড় বীর বা যোদ্ধার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। তখন তাকে 'পেজ' বা চাকরের মত কাজ করতে হত। এর পর চোদ্দ বছর বয়স হলে তাকে "স্কোয়ার" বলা হত। স্কোয়ার থাকার সময় সে যে যোদ্ধার অধীনে থাকত, সেই যোদ্ধার ঢাল বয়ে বেড়াত। এই সময় তাকে ঘোড়ায় চড়া, বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা শিখতে হত। লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা না থাকায়

অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের নাম পর্যন্ত সই করতে পারতেন না। একুশ বছর বয়স হলে সামরিক শিক্ষা শেষ হত। তখন সে পরিপূর্ণ ভাবে নাইট হতে পারত।

নাইট হবার আগে বিশেষ অনুষ্ঠান হত। সেই অনুষ্ঠানে রাজা বা বড় জমিদার তাকে বীরব্রতে দীক্ষা দিতেন। তখন তার উপাধি হত নাইট। দীক্ষার আগের দিন প্রত্যেক নাইটকে উপোস করে সারা-রাত মন্দিরে প্রদীপ জ্বেলে রেখে প্রার্থনা করতে হত। পরের দিন

নাইট

দীক্ষাদাতা তাকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে তলোয়ারের উল্টোদিক দিয়ে তার কাঁধ ছুঁয়ে তাকে "নাইট" বলে ঘোষণা করতেন।

নাইটদের মধ্যে অনেক রকম অর্ডার বা সম্প্রদায় ছিল। এক এক সম্প্রদায়ের পোষাক, অস্ত্র ও ধর্ম এক এক ধরনের। পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র দেখলে বোঝা যেত কে কোন সম্প্রদায়ের নাইট। সকলেই মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে লোহার চেন বা শিকলে তৈরি বর্ম পরত। নাইটদের ধর্মই ছিল যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তারা এই ধরনের ধাতু বা লোহার পোষাক পরত। এরা নিজের নিজের প্রভুর অধীনে থেকে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। যুদ্ধ না থাকলে নাইটেরা শিকার করত বা কৃত্রিম যুদ্ধ করত। দুদল বা দুজন নাইটের মধ্যে এই যুদ্ধকে টুর্ণামেণ্ট বলা হয়। রাজা কিংবা

সামন্তের দরবারে এই ধরণের টুর্ণামেণ্টের আয়োজন করা হত। প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হত। একটা বড় জায়গা ঘিরে তার চারদিকে নানা রঙের কাজকরা পতাকা ও সম্ভ্রান্ত বংশের মর্যাদাসূচক নিশান পুঁতে দেওয়া হত। বসবার জায়গাও থাকত। নাইটেরা দুদলে ভাগ হয়ে ভোঁতা অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তৈরি থাকত। আরম্ভে তূরীবাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করত। যে নাইট সব থেকে বেশী অন্যকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে পারত বা অন্যের অস্ত্র ভেঙ্গে দিতে পারত তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হত। বিজয়ী নাইট পুরস্কার পেত। তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

পঞ্চম পাঠ | শিভ্যাল্‌রি ও ট্রুবেদর

নাইট হলেই যে সবকিছু শেষ হত তা নয়। নাইট হলে পর এক জনের কর্তব্য অনেক বেড়ে যেত। নাইট হবার সময় একজনকে কতকগুলো শপথ নিতে হত; সব সময় সত্যি কথা বলা, রাজা ও খৃস্টধর্মকে মেনে চলা, স্ত্রীলোক ও আর্তদের রক্ষা ও সাহায্য করা এবং শত্রুর কাছ থেকে পিছু হটে না আসা—এই চারটে শপথ তাকে নিতে হত। এছাড়া নাইটকে পবিত্র জীবন যাপনের শপথ করতে হত। সব নাইটই যে শপথ মেনে চলত, ধর্মপালন করত তা নয়। এসব ছাড়াও একজন নাইটকে আরও কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হত—যেমন বীর ও সাহসী হওয়া, প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, আচার ব্যবহারে নম্র হওয়া ইত্যাদি। নাইটের এই সব আদর্শকে বলা হয় **শিভ্যাল্‌রি (Chivalry).**

সামন্তপ্রথার যুগে মানুষ যুদ্ধ ও নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝত

না। এই সময় মানুষের জীবনে একটা আদর্শের দরকার ছিল। সেই জন্যেই এইসব আদর্শ দাঁড় করানো হয়েছিল। খৃস্টধর্মের প্রভাবে এসে ইউরোপের দুর্দান্ত বর্বর জাতগুলো অনেক শান্ত, নম্র ও উদার হতে শিখেছিল। সেইজন্যে বলা যেতে পারে শিভ্যাল্‌রি খৃস্টধর্ম ও সামন্তপ্রথার যুক্ত ফল। অনেক দেশের দেশীয় সাহিত্যে শিভ্যাল্‌রিকে নিয়ে অনেক গল্প লেখা আছে। ফ্রান্সে এই ধরনের ভ্রাম্যমান গায়ক বা কবির দলকে **ট্রুবেদর** (Troubadour) বলা হয়। মধ্যযুগের বীর নাইটদের করুণ ও বীরত্বের গল্প নিয়ে গাথা রচনা করে এরা লোকেদের শোনাত। ফরাসী দেশেই এই রকম সাহিত্যের বেশী চল ছিল। রোঁলা ও অলিভারের গল্প নিয়ে রোঁলার **গীতিকাব্য** রচনা করা হয়েছিল। জার্মানীতে এই ধরনের দলকে **মিনেসিঙ্গার** (Minnesinger) বলা হত।

ইংলণ্ডের কাল্পনিক রাজা বীর আর্থার ও তাঁর বারজন নাইটের গল্প ও মহৎ দস্যু রবিন হুডকে নিয়ে অনেক গল্প এই গায়ক দলেরা রচনা করেছেন। ভারতবর্ষেও রাজপুত বীরদের গাথা নিয়ে ভারতের চারণ কবি ও গায়কেরা এই ধরনের দেশীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। এগুলোতে তাঁরা দেশীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন দেশে এইভাবেই দেশীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

ষষ্ঠ পাঠ | ম্যানর হাউস ও দুর্গপ্রাসাদ

জমিদারেরা তখন শহরে বাস করতেন না। তাঁরা নিজেদের এলাকার মধ্যে গ্রামে থাকতেন। জমিদারদের বাড়ীগুলোকে **ম্যানর হাউস** বলা হত। যেখানে বিপদের ভয় ছিল না সেখানেই জমিদারেরা ম্যানর হাউসে থাকতেন। ম্যানর হাউস ঘিরে থাকত গ্রাম, তবে দুর্গের মত ম্যানর হাউসগুলো বড় ছিল না। কিন্তু এতে থাকত

বড় এবং চওড়া খাবার ঘর এবং থাকবার জন্যে কয়েকটা ঘর। এই ঘরগুলো ছিল কিছুটা অন্ধকার। কিন্তু ম্যানরে জমিদারেরা বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই থাকতেন। ম্যানর হাউস ছিল কাঠের তৈরি।

যে সব অঞ্চলে গোলমাল বা ভয়ের কারণ ছিল সেই সব জায়গায় দুর্গ তৈরি করে জমিদারেরা থাকতেন। এগুলোর বেশির ভাগ ছিল পাথরের। অনেক জায়গা নিয়ে দুর্গ গড়ে উঠত। পাহাড় বা মাটির টিলার ওপর এগুলো তৈরি করা হত। দুর্গের চারিদিকে থাকত উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের বাইরে ছিল পরিখা। পরিখা সবসময়ই জলে ভর্তি থাকত। ভেতরে ঢোকবার জন্যে ছিল প্রবেশ পথ। দরজার পাল্লার গায়ে লোহার প্লেট লাগানো থাকত। পরিখা পার হবার জন্যে পুল ছিল। শত্রু আসছে খবর পেলে ঐ পুলকে টেনে ওপরে তুলে নেওয়া হত। একে ড্র-ব্রিজ বলা হয়। অন্য সময়ে পুল নামানো থাকত। পাঁচিলের ভেতর খোলা জমি। সেখানে ছিল খামার বাড়ী ও আস্তাবল। তারপর একটা বিরাট খোলা জায়গা বা চত্বর পড়ত। এই চত্বরের পর আবার ফটক ও পাঁচিল ছিল, সব শেষে থাকত দুর্গের মত বাড়ী। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে তারপর পড়ত ছাদ। সেটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। ঐ পাঁচিলের গায়ে ছোট ছোট ফোকর বা জানালা থাকত। শত্রুর গতিবিধি দেখবার জন্যে এবং ওখান থেকে শত্রুকে আঘাত করার জন্যে অস্ত্র ছোঁড়া হত। মাটির নীচে থাকত কারাগার। তার ওপর ভাঁড়ার ঘর। বাড়ীর মধ্যে উপাসনার জন্যে
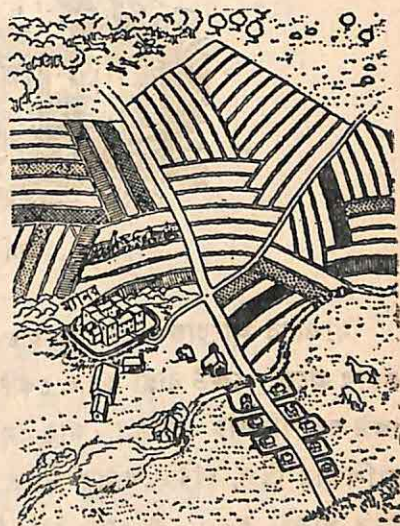
ম্যানর হাউস

ঘর, একটা প্রকাণ্ড হলঘর এবং কয়েকটা শোবার ঘর। খাবার ঘরটাই ছিল সুন্দর। মোমবাতি ও মশাল জ্বেলে রেখে ঘর আলো করা হত। ঘরকে গরম রাখার জন্যে ফায়ার প্লেস বা বড় বড় চুল্লী থাকত। বর্শা, ঢাল, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেওয়ালে সাজিয়ে রাখা হত। পুরু কাপড়ে নানারকমের সুন্দর সুন্দর কাজ করা ভারী পর্দা দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকত। এই ধরনের পর্দাকে ট্যাপেস্ট্রি বলা হত।
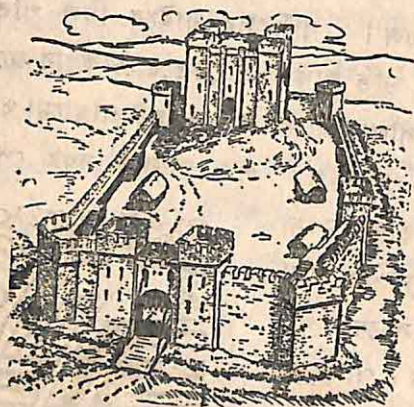
দুর্গ

খাওয়ার আয়োজন ভালো হত। অনেক চাকর থাকত কাজ করার জন্যে। কেউ রান্না করত, কেউ খাবার টেবিল সাজাতো আবার কেউ ঘর পরিষ্কার করত। মাছ, মাংস, সব্‌জি, মদ সবই খাদ্যের তালিকায় ছিল, হরিণ-ভেড়ার মাংস ছাড়াও নানা রকমের পাখীর মাংস খাওয়া হত। উৎসবে এবং বিশেষ বিশেষ নিমন্ত্রণের দিনে আস্ত ষাঁড় বা শুয়োর আগুনে ঝলসে টেবিলে রাখা হত। ইটালী ছাড়া অন্য কোনখানে তখনও কাঁটা চামচের ব্যবহার ছিল না। সেইজন্যে অতিথিরা নিজের নিজের ছোরা দিয়ে মাংস কেটে তুলে নিতেন। জমিদারদের ভাঁড় থাকত। চারণকবি এবং বাজীকরেরাও জমিদার বাড়ীতে আসত। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তারা নানা রকমের গল্প, গান ও খেলা দেখিয়ে অতিথিদের আনন্দ দিত।

সপ্তম পাঠ | কৃষক ও তাদের জীবন

গ্রামে জমিদারের বাড়ীকে "ম্যানর হাউস" বলা হত। এরই আশেপাশে খামার ও পতিত জমি থাকত। চাষের জমি আজকালকার মত ছোট ছোট অংশে ভাগ করা থাকত না, সব জমিই একসঙ্গে চাষ করা হত। গ্রামের লোককে দিয়েই জমি চাষ করিয়ে নেওয়া হত। অবশ্য জমিদার, পুরোহিত, চাষী, সকলেরই ফসলের অংশের পরিমাণ ঠিক করা ছিল—কারও বেশী, কারও কম।

চাষীদের প্রত্যেককেই গ্রামের এখানে ওখানে টুকরো টুকরো জমি দেওয়া হত। এতে সমস্ত ভাল বা মন্দ জমি কোনও একজনের ভাগে পড়ত না। এরা ছিল নীচু স্তরের প্রজা। সমস্ত সমাজের ভার বইতে হত এই ধরনের প্রজাকে। খৃষ্টীয় ধর্মোপাসক সমাজেও ছিল এই ব্যবস্থা। ছোট বড় কোন জমিদারই শস্য উৎপাদন করত না কিংবা কোন পরিশ্রমের কাজও করত না। খাদ্য এবং অন্যান্য দরকারী জিনিষ উৎপাদন করার ভার ছিল চাষী আর কারিগরদের ওপর। চাষী উৎপাদক এবং শ্রমিকের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব আদায় করাই ছিল সামন্ত প্রভুদের কাজ। আইনও ছিল জমিদার-দের পক্ষে, কেননা সেই আইন জমিদারেরা নিজেরাই তৈরি করেছিল। জমিদারেরা তাদের পাওনার বেশীই আদায় করে নিত। ফলে সামন্তপ্রভুকে খুশী রাখতে চাষীদের অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হত এবং অনেক বেশী জিনিষ দিতে হত।

এদের জীবনে প্রয়োজন বোধ ছিল খুবই কম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অধিকাংশ গ্রামে তৈরি হত। সুতরাং বাইরের সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না, চাহিদা অল্প হলেও ভবিষ্যতের জন্যে কোন সঞ্চয়ও ছিল না। গ্রামে কিছু শ্রমিকও থাকত, যেমন ছুতোর কামার, মিস্ত্রী প্রভৃতি।

সাধারণ গৃহস্থের সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা গরু, কয়েকটা শূকর আর কয়েকটা বলদ। ঘোড়া রাখার মত ক্ষমতাও অনেকের ছিল না। শত্রুরা আক্রমণ করলে যাতে সাহায্য পেতে পারে সেজন্যে তারা জমিদারের বাড়ীর কাছাকাছি থাকত। পুরুষেরা চাষ-আবাদ করত। মেয়েদেরও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। সবজি ফলানো, সূতো কাটা, পশম তৈরি করে জামাকাপড় বানানো, এই ছিল তাদের কাজ। ছেলেমেয়েরা মাঠে গরু ভেড়া চরাত, আর শস্য ক্ষেত থেকে পাখী তাড়াত। এদের খাবার-দাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ ধরনের। এরা সাধারণ চামড়া ও পশমের তৈরি পোশাক পরত। এদের প্রধান খাবার ছিল শক্ত রুটি, কিছু শাক শব্‌জি ও এক রকমের টক মদ। মাংস খাবার মত অবস্থা ছিল না। যদি কখনও মাংস তারা যোগাড় করতে পারত তাহলে তাতে নুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে শীতকালের জন্যে তুলে রাখত।

সাধারণ গৃহস্থ বাস করত কাঠ অথবা পাথরে তৈরি ছোট ছোট বাড়ীতে। তার চাল ছিল খড়ে ছাওয়া, আর মেঝে ছিল মাটির। ছোট ঘরের মধ্যে শূকর-ভেড়ার পালের মত গাদাগাদি করে একসঙ্গে অনেক লোক থাকত। উনোন আর তার ধোঁয়ার মাঝে এদের জীবন খুবই দুঃখে কাটত। ঘরগুলোর জানালাও ছিল ছোট ছোট। সেগুলো নোংরা তেলা কাপড়ে ঢাকা থাকত।

প্রত্যেক গ্রামেই একটা করে গির্জা ছিল। সেখানে একজন পাদ্‌রী থাকতেন। তিনি ধর্মকর্মের কাজ করতেন। ফসলের একটা অংশ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট থাকত। তিনি বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না—অর্ধশিক্ষিত ছিলেন। কয়েকটা ল্যাটিন প্রার্থনা ছাড়া তিনি বিশেষ কিছুই জানতেন না। গ্রামের ঐ পরিবেশের মধ্যে গির্জার অনুষ্ঠান মানুষের নীরস জীবনে কিছুটা আনন্দ ও বৈচিত্র্য আনত।

অষ্টম পাঠ | ফিউডাল প্রথায় শ্রেণী বৈষম্য

সামন্ত সমাজে শ্রেণী বিভাগ ছিল বেশ বোঝাই যাচ্ছে। এই রকমের সমাজ ব্যবস্থায় বহু স্তর ও শ্রেণী ছিল। ফিউডাল ব্যবস্থার প্রধান কথাই হচ্ছে শ্রেণী বৈষম্য। রাজা, জমিদার যাজক এবং জমির প্রজা মোটামুটি এই নিয়েই ছিল সমাজ ব্যবস্থা। সম্ভ্রান্ত এবং যাজক সম্প্রদায় সমাজের এবং রাষ্ট্রের সব কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। একদিকে জমিদার ও তার অনুগৃহীতের দল অন্যদিকে নিতান্ত গরীব ও অসহায় মানুষের দল। সম্ভ্রান্ত ও যাজক দলের প্রাসাদের চারিদিকে ছিল গরিবদের বস্তি। এ যেন দুটো পৃথিবী। একটার সঙ্গে আর একটার যোগাযোগ ছিল না। জমির মালিক চাষী ও প্রজাদের গরু বাছুরের মত মনে করত। সময় সময় ছোট ছোট যাজকেরা চাষীদের পক্ষ নিত ঠিকই কিন্তু তারা অনেক সময়ই জমিদারের পক্ষ সমর্থন করত। আর সেটা করাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ বিশপরা নিজেরাই ছিল এক একজন জমিদার বা প্রভু।

সব দেশেই জমির মালিকদের রীতিই এই। সামন্ত প্রথায় সাম্য কিংবা স্বাধীনতার কোনও স্থান ছিল না। ছিল অধিকার ও কর্তব্যের প্রশ্ন। অধিকার হিসেবে যাজক ও জমিদার বা সম্ভ্রান্তেরা তার পাওনাটা ষোল আনারও বেশী আদায় করে নিত। কিন্তু পরিবর্তে তারা কর্তব্যটা যেত ভুলে। এমনই হয়ে থাকে। মানুষের অধিকার আদায় করতে ভুল হয় না, যত ভুল হয় কর্তব্য পালন করতে। এইরূপেই আরম্ভ হয়েছিল স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ গণতন্ত্রবিরোধী মতের প্রচার-এর জন্যে দায়ী। পৃথিবীর সকল দেশের জমিদারেরা কৃষকের মুখের অন্য কেড়ে নেয়, ভূমি সংক্রান্ত আইন রচনা করে, অভিজাত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। পুরোহিতেরা এসে দরিদ্রদের ধর্মের কথা শোনায় আর অভিজাতদের

কাজের সমর্থন করে। সুতরাং বুঝতেই পারা যাচ্ছে ফিউডাল যুগে মানুষের বৃহত্তর সমাজ ও বৃহত্তর দেশের কথা ভাবত না। সকলেই তাদের উচ্চতর প্রভুকে সেবা করার কথা ভাবত, দেশ বা জাতিকে সেবা করার কর্তব্য তাদের মনে স্থান পেত না। এই জন্যে সমাজের নীচু তলার মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল খুবই দুঃখের। প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের মত এমন জঘন্য সম্পর্ক আর নেই।

নবম পাঠ | সামন্ত ও সামন্তদের জীবন

সমাজে সকলের চেয়ে প্রতিপত্তি ছিল সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত সম্প্রদায়ের। রাজার পরেই ছিল তাদের স্থান। ছোট বড় কোন জমিদার বা সম্ভ্রান্ত লোককে কোন কাজই করতে হত না। ওদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ করা আর যুদ্ধবিগ্রহ না থাকলে শিকার অথবা অপর কোন খেলা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত এবং সামন্তেরা ছিল নিরক্ষর ও মূর্খ। লড়াই করা আর মদ খাওয়া ছাড়া তাদের আর অন্য আমোদ-আহ্লাদের কথা মাথায় আসত না। অনেক বড় বড় ব্যারন বা সামন্তেরা এমনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, দুর্বল রাজা তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে। ফিফ্ বা জায়গীর ভোগ করত বলে সামন্তরা রাজার কাছে নতি স্বীকার করত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সামন্তরা নিজের নিজের অঞ্চলে থাকত যেন এক একজন ছোট রাজা। প্রয়োজনের সময় রাজাকে সাহায্য করতে হত বলে তারা বেশ বড় সৈন্যদল রাখত। তারা নিজের এলাকার মধ্যে ছিল সর্বময় প্রভু। তাদের অধীন প্রজাদের ওপর বিনা বাধায় প্রভুত্ব করত, তাদের কাছ থেকে কর আদায় করত এবং তাদের মামলা-মকদ্দমার বিচার করত। প্রভুর আদেশে প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হত না।

দশম পাঠ | সার্ফ ও তাদের মুক্তি

সামন্ত প্রভুদের জমি কৃষকেরা চাষ করত। সাধারণত এরা দু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণীর নাম ভিলেন, অন্য শ্রেণীর নাম সার্ফ। ভিলেন কথাটা ইংরাজী ভিল্লা কথা থেকে এসেছে। যারা ভিল্লা বা ম্যানরে থেকে চাষ-আবাদ করত তাদের ভিলেন বলা হত। ভিলেনরা অনেকটা স্বাধীন প্রজা, ক্ষেতে কাজ করে জমিদারকে সন্তুষ্ট রাখত। মনিবের বশে থাকবে এই প্রতিজ্ঞা করত। মনিব ও বিপদে তাদের রক্ষা করার ভার নিত, কিন্তু যারা সার্ফ তারা জমি ছেড়ে যেতে পারত না। জমির সঙ্গেই তারা বাঁধা থাকত। জমির কোন স্বত্ব ভোগ করত না, জমি ও জমিদারের সেবাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। অধিকাংশ সার্ফ ছিল মনিবের কাছে আবদ্ধ। ইচ্ছে করলেও তারা এক জমিদারের আশ্রয় ছেড়ে অন্য জমিদারের কাছে যেতে পারত না। জমি বিক্রী হলে জমির সঙ্গে তারাও অন্যের কাছে বিক্রী হয়ে যেত। এদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সার্ফদের অনেক কাজ করতে হত। ক্ষেতের কাজ বাদেও জঙ্গল কাটা, কাঠ বয়ে আনা, জল তোলা, গম পেষা ইত্যাদির কাজ করতে হত। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তারা জমি ছেড়ে যেতে পারত না। বা বিয়ে করতে পারত না।

অন্যদিকে ভিলেনদের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা থাকলেও তাদেরও প্রভুর জন্যে অনেক কাজ করতে হত। সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন তাদের বিনা মজুরিতে জমিদারের নিজস্ব জমিতে চাষ করতে হত। চাষের সময় অনেক সময় তাদের সপ্তাহে পাঁচদিনও প্রভুর জমিতে কাজ করতে হত। তাছাড়া গম, ওট এবং মুরগী প্রভৃতি জিনিষ প্রভুকে ভেট দিতে হত। তার নিজের কৃষিকার্যের জন্যে সময় খুবই কম পেত। ফলে পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে তাকে

প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। বিশ্রাম তার কপালে জুটত না বললেই চলে। যতদিন সে তার প্রভুকে তার পাওনা ঠিক ঠিক মত দিত এবং তার প্রভুর কাজ করে দিত, ততদিন সে নিরাপদ থাকত।

সার্ফদের জীবন গরুবাছুরের থেকে ভালো ছিল না। তাদের জীবনে মুক্তি সহজ ছিল না। সেইজন্যে অনেক সময় তারা প্রভুর আশ্রয় থেকে পালিয়ে শহরে চলে যেত এবং সেখানে যাতে আবার ধরা না পড়ে সেইভাবে কিছুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত। এইভাবে অনেক সার্ফ মুক্তি পেতে চেষ্টা করত। অনেকে আবার টাকা পয়সা জমিয়ে তার বিনিময়ে নিজেদের স্বাধীনতা কিনে নিয়েছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ব্যবসার খুব প্রসার হয়েছিল। ফলে সমাজে বণিক এবং কারিগরদের প্রাধান্য খুবই বেড়ে গিয়েছিল। চাষীরা টাকার পরিবর্তে এই সময় তাদের উৎপন্ন দ্রব্য শহরে বিক্রী করে দিত এবং সামন্তপ্রভুরা শস্যের পরিবর্তে টাকা নেওয়া অনেক ভালো মনে করত। এইভাবে তারা প্রভুদের জন্য শ্রম করার হাত থেকেও রেহাই পেল। অনেকটা বর্তমান যুগের মত হল বলা যায়। যেমন জমি চাষ করার জন্যে খাজনা দিতে হয়। অনেক সময় আবার রাজা এবং জমিদারেরা টাকার জন্যে জমিজমা অর্থশালী ব্যবসায়ী বা কাউকে বিক্রী করে দিত। এর ফলে নতুন নতুন যে শহর গড়ে উঠেছিল, সেখানে নানা ধরনের ব্যবসায়ের কেন্দ্রের জন্ম হল। এতদিন যারা দাসদের মত জমিদার বা সামন্ত-প্রভুদের অধীনে বাঁধা ছিল, তারা সেই সব শিল্প সংস্থাগুলোতে কাজ করে মুক্তি পেল।

শহর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেশে জাতীয়তা বোধের সৃষ্টি হল। কারণ নতুন চিন্তা ও নতুন ভাবধারা মানুষের মনে জাতীয়তা বোধের সৃষ্টি করে। পরাধীন মানুষ তখন মুক্তির জন্য অন্দোলন করে মুক্তি পায়।

অনুশীলনী

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) — — পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা ভেঙ্গে গিয়েছিল। (খ) আইনতঃ — ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। (গ) রাজা ছিলেন — প্রভু। (ঘ) সমাজ—পিরামিডের চূড়োতে ছিলেন —। (ঙ) বিশপের জমিদারিকে বলা হত —। (চ) সমাজে একমাত্র — ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। (ছ) রাজার মত পুরোহিত গোষ্ঠীকে মনে করা — ছায়া। (জ) মধ্যযুগে — আদর্শকে — বলা হয়। (ঝ) — ও — এর গল্প নিয়ে রেঁালার গীতিকাব্য রচনা করা হয়।

২। **দু'এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) "ফিফ্" বা "ফিউড" কি ? (খ) সমাজ-পিরামিডের ভিতে কারা ছিল ? (গ) মধ্যযুগের লোকেরা স্বর্গ সম্বন্ধে কি মনে করত ? (ঘ) পুরোহিতদের মধ্যে কে প্রধান ছিলেন ? (ঙ) পেজ কাদের বলা হত ? (চ) কত বছর বয়স হলে একজন পেজ স্কোয়ার হতে পারত। (ছ) টুর্ণামেণ্ট কাকে বলা হয় ? (জ) ট্রুবেদর কাদের বলা হত ? (ঝ) মিনেসিঙ্গার কারা ? (ঞ) সার্ফ ও ভিলেনদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। **সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর :—**

(ক) গ্রামাঞ্চলের জমিদারবাড়ীকে ("ম্যানার হাউস"/"ক্যাস্ল্") বলা হত। (খ) অধিকাংশ সার্ফ ছিল (স্বাধীন/মনিবের কাছে আবদ্ধ)। (গ) মধ্যযুগে সমস্ত জমি (একসঙ্গে/আলাদা আলাদা ভাবে) চাষ করা হত। (ঘ) মধ্যযুগের লোকেরা পোষাক তৈরি করত (পশম/তুলা) দিয়ে। (ঙ) সার্ফদের (কোন জমি ছিল না/জমির পরিমাণ ছিল খুব কম)।

৪। **ভ্রম সংশোধন কর :—**

(ক) সার্ফেরা ছিল অনেকটা স্বাধীন প্রজা। (খ) মাঝে মাঝে চাষীরা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে এক জায়গায় জমা হয়ে আমোদ-আহ্লাদ করত। (গ) "ম্যানার হাউসের" আশেপাশে থাকত জঙ্গল। (ঘ) মধ্যযুগে ইউরোপের নাইটদের আদর্শকে বলা হত বুসিড়ো। (ঙ) সামন্তেরা সব সময় রাজাকে বশে রাখত।

৫। **পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদগুলো একত্রিত কর :—**

(ক) ভিলেন	(১) ড্র-ব্রিজ
(খ) সার্ফ	(২) ডায়োসিজ
(গ) নাইট	(৩) ফিফ বা ফিউড
(ঘ) দুর্গ-প্রাসাদ	(৪) ভূ-দাস
(ঙ) বিশপ	(৫) জার্মানী
(চ) দত্ত জমি	(৬) স্বাধীন প্রজা
(ছ) ট্রুবেদর	(৭) শিভ্যল্‌রি
(জ) গিনি সিঙ্গার	(৮) ফ্রান্স

৬। সামন্ত প্রথা কি? জমির সহিত সামন্ত প্রথার সম্পর্ক আলোচনা কর।

৭। নাইট কাদের বলা হত? তাদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হত? নাইটদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হত, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। মধ্যযুগে ইউরোপে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা কি রকমের ছিল। তার বর্ণনা দাও।

৯। "ম্যানার হাউসের" বর্ণনা দাও। সেখানকার জীবনযাত্রা কিরকমের ছিল, তাহা আলোচনা কর।

১০। মধ্যযুগে সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রার পরিচয় দাও।

১১। ভিলেন ও সার্ফ কাদের বলা হত? সার্ফদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দাও। সার্ফেরা কি ভাবে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করত?

অষ্টম অধ্যায়
প্রথম পাঠ

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ক্রুসেডের সূচনা ঃ—মধ্যযুগের ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছে তার পেছনে ধর্মের প্রেরণাই ছিল সব থেকে বেশী। মঠ, সন্ন্যাসীর জীবন, জ্ঞানের চর্চা, সাহিত্য-রচনা সবই খৃস্ট-ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তীর্থযাত্রীরাও ধর্মের নামে পুণ্য সঞ্চয় করতে পবিত্র জায়গাগুলোতে যেত। যীশুখৃস্টের জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল জেরুজালেম, খৃস্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। আরবেরা অনেক দিন আগেই জেরুজালেম দখল করেছিল। তারা খৃস্টানদের কাছ থেকে তীর্থকর নেওয়া ছাড়া আর কিছু করত না।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সিরিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের অধীন হয়ে পড়ে। সিরিয়ার তুর্কীরা জেরুজালেমও অধিকার করে নেয়। এই সময় থেকে খৃস্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর তারা নানা অত্যাচার করতে থাকে।

তীর্থযাত্রা কষ্টকর ও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তুর্কীরা খৃস্টানদের মারধোর করত, কখনও বা বন্দী করে রেখে দিত। যাত্রীরা দেশে ফিরে সেই সব অত্যাচারের কথা বলত। ফলে খৃস্টান জগতে একটা সাড়া পড়ে গেল। খৃস্টানেরা মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করবার জন্যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ডাক দিল। কেবল যে ধর্মকে বাঁচাতে ক্রুসেড হয়েছিল তা নয়। সমস্ত এশিয়া মাইনর যখন তুর্কীদের অধীনে চলে গেল, তখন ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য পথগুলো তুর্কীদের দখলে চলে যায়। এতে ইউরোপের বণিকদের খুবই ক্ষতি হয়। বাইজানটাইনের সম্রাট পোপের কাছে বিষয়টি জানান। তখন ঠিক হয় তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পবিত্র তীর্থস্থান জেরুজালেম উদ্ধার করতে হবে। এই সময়ে ধর্মযুদ্ধের সমন্বয়ে পোপ দ্বিতীয় আরবেন এক বক্তৃতা দেন। সেখানে অনেক লোক

যোগ দেয়। পোপ তাদের বলেন যারা এই ধর্মযুদ্ধে যাবে তারা যত পাপী হোক না কেন, তাদের পাপ মুছে যাবে। এই কথা শুনে দলে দলে লোক ক্রুসেডে যেতে এগিয়ে আসে। পোপ নিজের হাতে তাদের ক্রুশ দেন। এই ক্রুশ লাগিয়ে তারা যুদ্ধ করতে যায়। যোদ্ধাদের নাম হয় ক্রুসেডার। এই ভাবে ক্রুসেডের সূচনা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ | প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড

প্রথম ক্রুসেড (খৃঃ ১০৯৬—১০৯৯ খৃঃ)

শোনা যায়, প্রথম ধর্মযুদ্ধের মূলে ছিলেন ফ্রান্সের সন্ন্যাসী পিটার। তিনি জেরুজালেমে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ওপর সেখানে খুব অত্যাচার করা হয়। নিজের চোখে তিনি তীর্থযাত্রীদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার দেখেন। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে তিনি রোমে যান। পোপের অনুমতি নিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করতে লোকদের একতাবদ্ধ হতে বলেন। রাইন নদীর দুপাশের শহরে এবং গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি এই কথা প্রচার করেন। সাধু পিটার ও ওয়ালটার পেনিলেস নামে এক নাইটের অধীনে হাজার হাজার লোক যারা যুদ্ধের কিছুই জানে না, তারাও যুদ্ধে গিয়েছিল। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ছিল গ্রামের চাষী। জেরুজালেমে যাবার পথে এই জনতা লুঠতরাজ আরম্ভ করে। ফলে গ্রামের লোক ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদের বাধা দেয়। অনেক ক্রুসেডারই এতে মারা যায়। বাকী যারা জেরুজালেমে পৌঁছায় তুর্কীরা তাদের সহজেই হারিয়ে দেয়।

অবশ্য আসল যে যুদ্ধ সে যুদ্ধ হয় এর পরে। এই যুদ্ধে কোন

রাজা যোগ দেননি। তবে অনেক সামন্ত প্রভুদের অধীনে বীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল। ১৫ই জুলাই ১০৯৯ খৃস্টাব্দে খৃস্টানেরা তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করে নেয়। সেখানে খৃস্টান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ক্রুসেডই সব চেয়ে সফল ক্রুসেড। কারণ এর ফলে খৃস্টানেরা প্রায় ৭০ বছর জেরুজালেমকে নিজেদের অধীনে রাখতে পেরেছিল।

তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯ খৃঃ—১১৯২ খৃঃ)

১১৬৯ খৃস্টাব্দে কুর্দীস্থানের সালাদীন নামক এক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতায় মিশর ও সিরিয়া জয় করে সেখানকার রাজা হন। তিনি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদের (ধর্মযুদ্ধের) ডাক দেন। প্রথম ক্রুসেডের সময় যেমন খৃস্টানেরা মেতে উঠেছিল, এই ক্রুসেডের ডাকে মুসলমানেরা সেই রকম মেতে ওঠে। এই উত্তেজনার ফলে ১১৮৭ খৃস্টাব্দে খৃস্টানদের কাছ থেকে সালাদীন জেরুজালেম কেড়ে নিয়েছিলেন। এই খবর পাবার পর সমস্ত ইউরোপে আবার আলোড়ন দেখা দেয়। ফলে ১১৮৯ খৃস্টাব্দে তৃতীয় ক্রুসেড আরম্ভ হয়।

তৃতীয় ক্রুসেড আরম্ভের সময় দেখা যায় যে, আগের মত সাধারণ লোকেরা আর এতে যোগ দেয় নি। এখন ধর্মের নামে রাজায় রাজায় লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে ইউরোপের তিনজন বড় বড় রাজা যোগ দিয়েছিলেন—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবরোসা। এঁরা তিনজনেই বড় বীর ছিলেন। ফ্রেডারিকের দাড়ির রঙ লাল। এই জন্যে তাঁকে 'বারবরোসা' বলা হত। তিনি স্থলপথে যাত্রা করে এশিয়া মাইনরে পৌঁছান। কিন্তু যুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইনে যাবার পথে তিনি একটা নদী পার হতে গিয়ে ডুবে মারা যান। তাঁর সৈন্যেরা মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হয়। অনেক জার্মান সৈন্যকে তারা ক্রীতদাস করে রাখে। ফিলিপ এবং রিচার্ড তাঁদের দেশ থেকে সমুদ্রপথে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে একটা নগর দখল করেন।

অবশেষে তাঁরা জেরুজালেমের কাছে পৌঁছালেন। কিন্তু ফিলিপ ও রিচার্ডের মধ্যে কে নেতা হবেন এই নিয়ে ঝগড়া বাঁধে। রিচার্ড ফিলিপকে রাজা ও যোদ্ধা হিসাবে যোগ্য মনে করতেন না, তাঁর নেতৃত্বও মানতেন না। ফলে ফিলিপ চলে যান। রিচার্ড একাই যুদ্ধ করেন।

তৃতীয় ক্রুসেড রিচার্ড ও সালাদীনের বীরত্বের গল্প। তাঁরা পরস্পর শত্রু হলেও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। গল্পে আছে, রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে সালাদীন তাঁর নিজের চিকিৎসক ও পথ্যের জন্যে ফলমূল রিচার্ডকে পাঠিয়েছিলেন। একবার রিচার্ডের ঘোড়া যুদ্ধে মারা গেলে সালাদীন তাঁকে একটা ভালো আরবী ঘোড়া উপহার দেন। অনেকদিন যুদ্ধ করেও রিচার্ড জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেন নি। শেষে সালাদীনের সঙ্গে এক সন্ধি হয়। ঠিক হয় খৃস্টানেরা অবাধে জেরুজালেমে যেতে পারবে। এরপর রিচার্ড ইংলণ্ডে ফিরে আসেন।

চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২ খৃঃ—১২০৪ খৃঃ)

১১৯৮ খৃস্টাব্দে তৃতীয় ইনোসেন্ট পোপ হয়ে তিনটে কাজের কথা ঘোষণা করেন। তার মধ্যে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা ছিল একটা কাজ। এইজন্যে পোপ হবার পর তিনি বিভিন্ন রাজাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। প্রথমে কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দেয় নি। দ্বিতীয়বার আবেদন করে বলেন সমস্ত পাপ থেকে তিনি যোগদানকারীকে মুক্তি দেবেন। যুদ্ধের খরচের টাকা যাজকশ্রেণীর কাছ থেকে করস্বরূপ আদায় করা হবে, একথাও পোপ বলেন। প্রধানতঃ ফরাসী ও নর্মানদের নিয়ে ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করা হয়। ইনোসেন্ট ঠিক করেন মুসলমানদের শক্তিকেন্দ্র ইজিপ্ট আক্রমণ করবেন। ভেনিসে সমস্ত সৈন্য জড় হয়। ১২০২ খৃস্টাব্দে ভেনিস থেকে অভিযান আরম্ভ

বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে। জারো বন্দর অধিকার করে ১২০৩ খৃস্টাব্দে ক্রুসেডাররা কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লে পৌঁছায়। ঠিক হয় সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করা হবে। কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ক্রুসেডাররা মার্চ ১২০৪ খৃস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার করে, তিনদিন ধরে লুঠতরাজ চালায়। এমন কি, চার্চগুলোও বাদ পড়ে না। প্রকৃত পক্ষে বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেই এই আক্রমণ করা হয়। সেখানে বল্ডউইনের অধীনে একটা ল্যাটিন রাজ্য গড়ে ওঠে। ১২৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই ল্যাটিন রাজ্যটা ছিল। পরে অবশ্য গ্রীকেরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এর কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যটা দখল করে নেয়। এছাড়া আরও চারটে ক্রুসেড এবং 'বালকদের ক্রুসেড' নামে একটা দুঃখজনক ক্রুসেড হয়েছিল।

তৃতীয় পাঠ | ক্রুসেডের ফলাফল

১২৯১ খৃস্টাব্দে ক্রুসেড শেষ হলে খৃস্টানেরা কেবল জেরুজালেমে যীশুর সমাধি দেখার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু নিষ্ফল হলেও, ইতিহাসে ক্রুসেডের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তবে বড় কথা, ক্রুসেডের ফলেই ইউরোপে মুসলমানদের আধিপত্য গড়ে ওঠে নি।

সমাজ ও ধর্মের উপর প্রভাব :—সমাজের ওপর ক্রুসেডের প্রভাব পড়ে। এই সময় ছিল অন্ধ বিশ্বাসের যুগ। পোপ ভগবান ও পাপ-পুণ্যের দোহাই দিয়ে জনসাধারণ ও রাজাদের ওপর প্রভুত্ব খাটাতেন। পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস কারও ছিল না। সামন্ত প্রথাও চলছিল। কিন্তু ক্রুসেডের ফলে এ সবই পালটে যায়। পোপের বিরুদ্ধেও জনমত গঠন হয়।

ক্রুসেডের ফলে সামন্ত প্রথা লোপ পায়। সামন্তপ্রভুরা অনেকেই তাদের জমি জায়গা বিক্রি করে

জন্যে। সেই সঙ্গে তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকারও লোপ পায়। সামন্তপ্রভুরা অনেক সামন্ত-প্রজাদের ছাঁটাই করে দেন। সার্ফরা মুক্তি পায়। শ্রমিকের দরকার হয়। এইসব সামন্তপ্রভুরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্যেও উৎসাহ দিয়েছিলেন। ব্যবসা-বণিজ্য করতে গেলে জাহাজের দরকার হয়। এই কারণে জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠল। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। ইউরোপের বণিকেরা এশিয়া থেকে নানা রকমের জিনিষ নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। চিনি, তুলো, সিল্ক, খেজুর, মৃগনাভি, হাতির দাঁতের তৈরি জিনিষ, নানা ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ, কম্বল, খাদ্যশস্য, গন্ধদ্রব্য, মশলা, ওষুধ প্রভৃতি জিনিষ বণিকেরা নিজেদের দেশে আমদানি করত। একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, ক্রুসেডের ফলেই ইউরোপ ধনী হতে পেরেছিল। ব্যবসা করে শহরগুলো, বিশেষ করে উত্তর ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, খুবই লাভবান হয়েছিল। যেখানে জীবনে কোনও সুখ ছিল না, সেখানে নতুন নতুন জিনিষ ও অর্থ পেয়ে মানুষের জীবনে এল সুখ। নতুন অর্থনীতির ফলে নতুন সমাজের সৃষ্টি হল। এইরূপে নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার জন্ম হয়। বণিক, ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে দেখা দিল।

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ—ইউরোপীয়েরা ক্রুসেডের আগে নিজেদের দেশ ছেড়ে বাইরে যেত না; কিন্তু ক্রুসেডে যাবার ফলে তাদের ভৌগোলিক জ্ঞান বাড়ে। ভূমধ্যসাগর, এশিয়া ও আফ্রিকা সম্বন্ধে তাদের পুরো ধারণা হয়। ইউরোপীয়েরা দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে। আবিষ্কারক ও ভ্রমণকারীর দল বেরিয়ে পড়ে। বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয়দের মনের যথেষ্ট প্রসার হয়। এই সময়ই মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপের দেশগুলোতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নগর প্রতিষ্ঠার ফলে বিদ্যাচর্চা ও স্বাধীন মনোভাবের জন্ম হয়। মুসলমানদের কাছ থেকে ইউরোপীয়েরা অঙ্কশাস্ত্র ও সংখ্যাতত্ত্ব,

নানা রকমের ওষুধের ব্যবহার, কাঁচ ও কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি শিখে নেয়। সব শেষে বলা যেতে পারে, ক্রুসেডের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে যোগাযোগ হয়েছিল, তারই ফলে পূর্বদেশের সংস্কৃতি পশ্চিমী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনুশীলনী

১। ক্রুসেড কথার অর্থ কি? মোট কয়টা ক্রুসেড হয়? ক্রুসেড কেন হয়েছিল?

২। প্রথম ক্রুসেড কবে হয়েছিল? ঐ ক্রুসেডের বিষয় বল।

৩। রিচার্ড ও সালাদীন কে ছিলেন? রিচার্ডের সঙ্গে সালাদীনের কি রকমের সম্পর্ক ছিল?

৪। চতুর্থ ক্রুসেডের বর্ণনা দাও।

৫। সমাজের ওপর ক্রুসেডের প্রভাব আলোচনা কর।

৬। **দু'এক কথায় উত্তর দাও:**

(ক) জেরুজালেম কি জন্যে বিখ্যাত? (খ) যারা ক্রুসেডের যুদ্ধ করত তাদের ক্রুসেডার কেন বলা হয়? (গ) সবচেয়ে সফল ক্রুসেড কোন্‌টি? (ঘ) ফ্রেডারিককে 'বারবরোসা' কেন বলা হত? (ঙ) ক্রুসেডের ফলাফলের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ?

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর:—**

(ক) সাধু পিটার ও — — নামে এক নাইটের অধীনে হাজার হাজার লোক প্রথম ক্রুসেডে গিয়েছিল। (খ) তৃতীয় ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের রাজা —, ফ্রান্সের রাজা — এবং জার্মানীর সম্রাট —। (গ) ক্রুসেডের ফলে — লোপ পায়। (ঘ) পিসা শহরটা ছিল — তে।

নবম অধ্যায়
প্রথম পাঠ

মধ্যযুগের নগর

নগরের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধিঃ রোমানদের শাসনকালে ইউরোপে অনেক বড় বড় শহর ছিল। কিন্তু বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেইজন্যে বড় বড় শহর দেখা যায় না। দেশে যখন আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে, তখন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয় এবং তখন শহরগুলো আবার নতুন করে গড়ে উঠতে থাকে। মধ্যযুগের বেশীর ভাগ শহরই কোনও সামন্তপ্রভুর দুর্গকে অথবা মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। যাতায়াতের যেখানে সুবিধা ছিল, সেখানে শহর গড়ে উঠেছিল। কিছু কিছু শহর পুরানো রোমান শহরগুলোর কাছেও গজিয়ে ওঠে।

ক্রুসেডের সময়ও অনেকগুলো শহর হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধে যাবার সময় যোদ্ধারা যে পথ দিয়ে যেত সেইসব পথের ধারে ক্রুসেডারদের রসদ যোগান দেবার জন্যে দোকান-পাট বসত। এইসব বাজারকে কেন্দ্র করেও নগর গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ইউরোপে বেশ বেড়ে যেতে থাকে। ফলে শহরগুলোর সমৃদ্ধি হয়। এই সময়ে ইটালিতে জেনোয়া, ভেনিস, মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বড় বড় শহরের জন্ম হয়েছিল। ভেনিস এবং জেনোয়ার মধ্যে পূর্বদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চলত। এতে ভেনিসেরই জয় হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসের লোকসংখ্যা ছিল দু'লক্ষ এবং নৌ-শক্তিতে ভেনিস ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। পূর্ব দেশের সঙ্গে ভেনিসের সম্পর্ক যে কেবল ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, শহর তৈরি এবং সাজানোর ব্যাপারেও পূর্ব-দেশের ছাপ পড়েছিল। শহরের বাড়ীঘরগুলো তৈরি হয়েছিল পূর্ব-দেশের স্থাপত্য-রীতিতে। যখন তুর্কীদের হাতে পূর্বদেশের বাণিজ্য চলে

যায়, তখন ভেনিসের গৌরবও চলে যায়। একসময় জেনোয়া কৃষ্ণ-সাগর দিয়ে পূর্ব-দেশের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য চালাত। জেনোয়া ও ভেনিস দুটি নগরেই প্রজাতন্ত্র শাসন চলছিল। এই সময়ের ফ্লোরেন্সকে অনেক দিক থেকে এথেন্সের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

জার্মানীর দক্ষিণে আগস্‌বার্গ, নুরেমবার্গ প্রভৃতি শহরগুলো ভেনিস ও উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্যপথে থাকায় ব্যবসায় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রাইন নদীর তীরে কলিঞ্জ শহরটি জার্মানীর সঙ্গে ইংরাজদের ব্যবসার ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও ব্রুজেস্‌ ও ঘেণ্ট শহরও

মধ্যযুগের শহর

ব্যবসার সূত্রে বেড়ে ওঠে। তবে এই সময় লণ্ডন, ব্রিস্টল ও নরউইচ খুবই ছোট শহর ছিল।

বর্তমান যুগের একটা গ্রামের চেয়ে এই শহরগুলো বড় ছিল বলে মনে হয় না। এইসব শহরের লোকেরা শহরের যিনি প্রভু বা অধিপতি ছিলেন তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই অধীনে জীবন কাটাত। সামন্তযুগের সার্ফদের চেয়ে এদের জীবন ভালো ছিল না। ব্যবসার জন্যে তাদের নানা কর দিতে হত। কিন্তু ব্যবসা বাড়ার

ফলে যখন তাদের হাতে টাকা পয়সা জমল তখন তারা স্বাধীন হতে ইচ্ছে করল। রাজা অথবা অন্যান্য প্রভুদের দুর্গ নির্মাণ বা যুদ্ধের জন্যে অথবা ক্রুসেডে যেতে টাকার দরকার হত। ফলে তাঁরা টাকার পরিবর্তে শহরের ওপর সব অধিকার ছেড়ে দেন। শহরের লোকেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যে সমিতি গড়ে তুলল। এগুলোকে গিল্ড বলা হত।

দ্বিতীয় পাঠ | গিল্ড

শহরবাসীদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা ধরনের শিল্পের কাজ করত। প্রত্যেক শহরে বণিকেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যে সঙ্ঘ (Guild) তৈরি করেছিল। একাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যেক শহরে বণিক সঙ্ঘ বা ট্রেডগিল্ড ছিল। এই গিল্ড শহরের ভিতরে বেচা-কেনার দেখাশুনা করত। তবে খাদ্যশস্যের ওপর কোনও রকমের কর দিতে হত না। এই গিল্ড বাজারে আমদানী হওয়া সমস্ত মাল একজনকে কিনতে দেওয়া কিংবা জিনিসপত্র মজুত রেখে পরে বেশী দামে সেগুলি বিক্রী করা প্রভৃতি অসাধু উপায়ে ব্যবসা করতে দিত না। আর এক রকমের গিল্ড ছিল, তাদের বলা হত ক্রাফ্‌ট গিল্ড বা শিল্প সমিতি।

ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমিতির পক্ষে সমস্ত শিল্পী ও শ্রমিকদের কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হত না। সেইজন্যে প্রত্যেকটি শিল্পের জন্যে পৃথক পৃথক সমিতির সৃষ্টি হল। কামার, ছুতোর, স্যাকরা, রাজমিস্ত্রি সবারই আলাদা আলাদা গিল্ড ছিল। সেগুলোকে ক্রাফ্‌ট গিল্ড বলা হত।

বণিকসঙ্ঘ শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনো করত, আর শিল্পী-

সঙ্ঘ শিল্পীদের সুযোগসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখত। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীসঙ্ঘ বণিকসঙ্ঘের অংশ হিসাবে কাজ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে সব শিল্পীসঙ্ঘ এক সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা সাধারণ গিল্ড গঠন করে।

গিল্ডের নিজস্ব নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম মেনে তাদের চলতে হত। তারা সব জিনিষের দাম বেঁধে দিত। শিল্পীদের কাজের ঘণ্টা ও মজুরিও ঠিক করে দিত। কেউ এই নিয়ম ভাঙতে পারত না। কোন নীচু মানের জিনিষ বিক্রী করা চলত না। ওজন কম দিলে বিক্রেতাকে শাস্তি দেওয়া হত। ঠক এবং মুনাফাখোরদের শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। এক শহরের লোকে অন্য শহরে ব্যবসা করতে চাইলে তাকে বিশেষ ধরনের কর দিতে হত।

গিল্ডগুলোতে কাজ শেখাবার জন্যে এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবিশ নেওয়া হত। তারা মাস্টার বা ওস্তাদের কাছে কাজ শিখত। সাধারণ কাজ শিখতে তিন বছর, সোনারূপোর কাজের জন্যে দশ বছর সময় লাগত। শিক্ষানবিশির সময় ওস্তাদের কাছে খেয়ে কারিগরি শিখত, দোকানের মালও বেচত। শেখার পালা শেষ হলে কাজের নমুনা দেখিয়ে পরীক্ষা দিতে হত। এই রকমের শ্রেষ্ঠ নমুনাকে মাস্টারপিস্ বলা হত।

এইসব গিল্ড অনেক ভালো কাজও করত। কোনও কারিগর মারা গেলে বা অসুস্থ হলে তারা সেই লোকের পরিবারকে সাহায্য করত। কাজ করতে করতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সহ-যোগী কারিগর তার কাজ শেষ করে দিত। ফলে অসুস্থ শিল্পীর কোন আর্থিক ক্ষতি হত না। অনেক গিল্ড আবার ইস্কুল চালাত, গির্জা ইত্যাদি তৈরি করতে চাঁদাও দিত। গিল্ডগুলো অনেক সময় নাটক করত। মধ্যযুগে নাটকের উন্নতির জন্যে গিল্ডগুলোর যথেষ্ট দান আছে। বড় বড় নগরগুলোর একটা করে গিল্ডহল থাকত। এখানেই গিল্ডের সমস্ত কাজ হত। পরে এগুলোই টাউনহলে পরিণত হয়। এখান থেকেই নগরের কাজ চালানো হত। ধীরে ধীরে

শহরের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। শহরগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের মত নিজেদের শাসন নিজেরাই মেয়র এবং কয়েকজন অল্ডারম্যান প্রভৃতি কর্মচারী নির্বাচন করে চালাত। কোনও কোনও শহর নিজের টাকাও তৈরি করে চালাত। ইটালি এবং জার্মানীর অনেক শহর এইভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। এইসব শহরে সেখানকার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের লোকেরাই শাসন করতেন।

তৃতীয় পাঠ — নগরের জীবন ও বুর্জোয়া শ্রেণী

আজকালকার নগরের চেয়ে আগেকার নগরগুলো অনেক ছোট ছিল। শত্রুর হাত থেকে এগুলোকে রক্ষা করার জন্যে চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। ছোট হলেও নগরগুলোর লোকসংখ্যা বেশ ছিল। প্রত্যেক নগরে ঢোকবার এবং বেরুবার জন্যে কয়েকটা প্রবেশ-পথ ছিল। রাতে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হত। বাড়ী-গুলো মোটেই সুন্দর ছিল না। বেশীর ভাগই ছিল কাঠের বাড়ী। আগুন লাগার ভয় ছিল। জলের কোন ভালো ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তার দুপাশে বাড়ীগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক সময় ওপরের তলা বেশ কিছুটা রাস্তার ওপর এগিয়ে আসত। ফলে রাস্তার দুপাশের বাড়ীর ওপরের মধ্যে দূরত্ব খুব কম থাকত।

নগরের পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর। পথঘাট ছিল সরু ও আঁকাবাঁকা। বেশীর ভাগ রাস্তাই ছিল কাঁচা। বর্ষাকালে সেগুলো জলে কাদায় ডুবে থাকত। নর্দমার সঙ্গে রাস্তার কোন তফাৎ ছিল না। শুয়োর, কুকুরের পাল যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। আশে পাশের বাড়ীর সমস্ত ময়লা রাস্তার ওপরেই ফেলা হত। জল বের করবার বা ময়লা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। রাস্তায় আলো দেবার ব্যবস্থাও ছিল না। কেবল

রাতে পাহারাদারেরা লাঠির মাথায় লণ্ঠন বেঁধে রাস্তায় টহল দিত। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোর-ডাকাতেরা রাস্তায় উপদ্রব করত। প্রত্যেক শহরে বাজার ও মেলা বসবার জায়গা থাকত। বাজারে অনেক রকমের দোকান ছিল। অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানত না। সেইজন্যে দোকানে একটা চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখা হত, যে জিনিষের দোকান তারই চিহ্ন। এক-একটা রাস্তায় এক-এক ধরনের জিনিষ পাওয়া যেত। বাইরের থেকে লোক এলে যাতে থাকতে পারে তার জন্যে সরাইখানা ছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণী ঃ—ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে শহরগুলোর উন্নতি হয়। মানুষের হাতে ধনসম্পত্তি জমতে আরম্ভ করে। অর্থনীতির নতুন প্রভাব নতুন সমাজ তৈরি করে। প্রাচীনকালে নগর তৈরি করেছিল রাজা, সম্রাট বা দিগ্বিজয়ী বীরেরা। একালে নগর প্রতিষ্ঠা করল ব্যবসায়ী, সওদাগর ও বণিকেরা। এরা দেশ-বিদেশে ব্যবসা করে অনেক টাকা লাভ করত। সমাজ-জীবনে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। এদের বলা হত **বুর্জোয়া** বা **মধ্যবিত্ত**। বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগল। তখন পুরোনো বনেদী স্বার্থের সঙ্গে এদের বিবাদ দেখা দিল। তার নাম **শ্রেণী-সংগ্রাম**। জমিদার, রাজা বা ব্যারনদের কাছ থেকে এরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেই আদর্শ বুর্জোয়ারা ধরে রাখতে পারল না। ক্রমে এই বুর্জোয়া শ্রেণী বনেদীদের সঙ্গে একমত হয়ে গেল অর্থাৎ তারা জনসাধারণকে শোষণ করতে লাগল। পরবর্তী যুগে এর ফল খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াল।

অনুশীলনী

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) ইটালির দুটো প্রসিদ্ধ শহরের নাম কর। (খ) নুরেমবার্গ শহরটা কোথায় ছিল? (গ) ক্রাফ্‌ট-গিল্ড কথার অর্থ কি? (ঘ) "মাস্টারপিস" কাকে বলা হয়? (ঙ) 'বুর্জোয়া' কথার বাংলা অর্থ কি? (চ) মধ্যযুগে নগর প্রতিষ্ঠা কারা করেছিল?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) জেনোয়া ও ভেনিস দুটো নগরেই — শাসন প্রচলিত ছিল। (খ) — পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। (গ বড় বড় নগরগুলোতে — থাকত। (ঘ) পুরানো বনেদী স্বার্থের সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিবাদকে — — বলে।

৩। মধ্যযুগের কয়েকটা নগরের নাম কর। কিভাবে নগরের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি হল বর্ণনা কর।

৪। 'গিল্ড' কাকে বলে? কয় প্রকারের গিল্ড ছিল? গিল্ডের কাজ কি ছিল?

৫। মধ্যযুগে নগর-জীবনের বর্ণনা কর।

৬। বুর্জোয়া কথার অর্থ কি? কাদের বুর্জোয়া বলা হয়? বুর্জোয়াদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান বল।

দশম অধ্যায়
প্রথম পাঠ

সুদূর পূর্বে মধ্যযুগ
[সপ্তম হইতে চতুর্দশ শতাব্দী]

(ক) চীন

তাং যুগ ও চীনের ঐক্য ঃ সুই রাজারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে লি পরিবারকে শাসনের ভার দিয়েছিলেন। ঐ অঞ্চলের সীমান্তে তাতাররা থাকত। তারা ছিল ভীষণ যুদ্ধবাজ। সেইজন্যে শাসনকর্তাদের সীমান্তের ওপর কড়া নজর রাখতে হত। কিন্তু লিরা ছিল আরামপ্রিয় এবং কোন কাজের সিদ্ধান্ত নিতেও দেরী করত। ফলে সৈন্যবাহিনীর কাজের বিশেষ অসুবিধে হত। তের বছর বয়সের লি পরিবারের দ্বিতীয় ছেলে যার যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সেই যুদ্ধে নেতার কাজ চালাত। দুর্ধর্ষ ও অভিজ্ঞ সৈন্যদের চলতে হত ঐ রকম কমবয়েসী এক ছেলের আদেশে। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এই বালকটির নাম ছিল শিমিন্।

শিমিনের বয়স যখন ১৫ বছর, তখন তিনি অসাধারণ তীরন্দাজ ও প্রথম শ্রেণীর ঘোড়সওয়ার হয়ে ওঠেন। যুদ্ধের কলা-কৌশলেও তিনি অভিজ্ঞ সমরনায়কদের হার মানাতেন। একবার চীনসম্রাট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভেতর দিয়ে চীনের প্রাচীরের ওপারে তুর্কীদের মাঝে গিয়ে পড়েন। কোন রকমে প্রাণ বাঁচাতে একটা ছোট দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সেই খবর শিমিনের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। শিমিন সম্রাটকে এক অভিনব কৌশলে উদ্ধার করেন। তিনি একটা ছোট চীনা বাহিনীকে এমনভাবে ধূলো উড়িয়ে যেতে বললেন যাতে তুর্কীরা মনে করল একটা বিরাট চীনা বাহিনী তাদের আক্রমণ করতে আসছে। তুর্কীরা

বিরাট চীনা বাহিনী আক্রমণে আসছে ভেবে পালিয়ে যায়। সম্রাট উদ্ধার পান।

এই সময় নানা কারণে সম্রাটের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। চীন-সম্রাট বিদ্রোহ দমনের জন্যে শিমিনের বাবাকে আদেশ দেন। শিমিন বাবাকে বিদ্রোহ দমন না করতে পরামর্শ দেন। কারণ বিদ্রোহ দমন করলে সম্রাট শিমিনের বাবাকে মেরে ফেলবেন, যেহেতু সম্রাটের চেয়ে তখন তাঁর ক্ষমতা বেড়ে যাবে। শিমিনের বাবা আদেশ পালনে দেরী করায় সম্রাট তাঁকে বিচারের জন্যে শমন জারি করেন। শিমিনের বাবা তখন বুঝলেন ছেলের কথাই ঠিক। তিনি তখন প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরোধিতা করেন। চীনসম্রাট ক্ষমতাচ্যুত হন। প্রতিষ্ঠা হল তাং বংশের।

শিমিনের একটা ছোট সুগঠিত বাহিনী ছিল। এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতেন। চীন সম্রাটের বাহিনীসহ আরও এগার জন সিংহাসনের দাবীদারকে তিনি পরাস্ত করেন। চীনবাসীর কাছে শিমিন এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। অনেক সময় তিনি তাঁর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা না করে ক্ষমা করে নিজের অধীনে কাজে নিযুক্ত করতেন।

সিংহাসনের দাবীদার মধ্যে তখনও বেশ শক্তিশালী দুজন রাজধানীর কাছেই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। শিমিনের শাসন মেনে নিয়েছিল সমগ্র চীন। কেবল ঐ দুজন দাবীদার চীনের উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাং বাহিনী ওঁদের দুপাশে রেখে মাঝখান দিয়ে এগুতে লাগল, যাতে ওঁরা একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিতে না পারেন। সিংহাসনের দাবীদারদের একজন চেঙ্ নিজেকে "প্রথম সম্রাট" বলতেন। তিনি দুই সম্রাটকে পরাস্ত করে হত্যা করেন। লো ইয়াং শহর দখল করে নেন। তাঁর অত্যাচারের জন্যে তাঁর শাসন কেবল রাজধানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ

প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল। কিন্তু অপর দাবীদার নিজেকে সিয়া রাজবংশের বলে দাবী করতেন। তিনি শিমিনের মতই যোগ্য ছিলেন। পূর্ব চীনে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল, তাংদের যেমন ছিল উত্তর পশ্চিম চীনে।

সিয়া রাজা চেঙ্‌কে অবরোধ থেকে বের করে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে লো-ইয়াং-এর দিকে যাত্রা করলে, শিমিন্ সেই খবর পান। শিমিনের সৈন্য-সংখ্যা সিয়া রাজার তুলনায় অনেক কম ছিল। তুর্কীদের প্রতিরোধ করার কাজে নিজের প্রদেশে সৈন্য রাখার জন্যে নতুন সৈন্য আনাও শিমিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সবাই শিমিনকে নিজের এলাকায় ফিরে যেতে যুক্তি দিল। কিন্তু শিমিন্ অল্প সংখ্যায় বাছাই সৈন্য নিয়ে শিয়ার সৈন্যদলকে সু-সুই শহরের কাছে বাধা দিতে গোপনে আদেশ দিলেন। সু-সুই শহর একটা উপত্যকায় অবস্থিত। যে রাস্তা দিয়ে সৈন্য এগুবে সেই রাস্তাকে আড়াআড়ি ভাবে একটা ছোট নদী ছেদ করে বয়ে চলেছে। ঐ শহরটা ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল। ফলে মাত্র ৩৫০০ সৈন্য নিয়ে শিমিন্ সিয়ার বিরাট বাহিনীকে আটকে রাখতে পারলেন। সিয়ার সৈন্যদের খাদ্যের অভাব হল। তখন সিয়ার সেনানায়কেরা তাঁকে পরামর্শ দিল তাং রাজ্যের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করতে। শিয়া রাজা, চেঙ্‌কে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিতে অটল রইলেন। তিনি শিমিনের বাহিনীকে সমতল জায়গায় বের করে আনবার জন্যে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করলেন। এতে ফল হল বিপরীত। সিয়া রাজার সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ল। তাদের আর সংহত করা সম্ভব হল না। সিয়া-রাজকে বন্দী করে শিমিন্ লো-ইয়াং-এ নিয়ে যান। লো-ইয়াংয়ের দুর্গের কাছে নিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষকে সিয়া রাজার অবস্থা দেখিয়ে বললেন, "তোমাদের সব শেষ। তোমাদের রক্ষাকর্তা আর কেউ নেই।" এরপর শিমিনের সামনে আর তেমন কোনও প্রতিরোধ রইল না।

কাজ আরম্ভ করলেন ৬২৪ খৃস্টাব্দে। দেশে আবার শান্তি ফিরে এল। শিমিন্, তাং তাই সুঙ্ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন।

আইন সংস্কার ঃ তাই সুঙ্ সম্রাট হয়ে দেশে আইন-শৃঙ্খলার কাজে মন দিলেন। তাং যুগের পূর্বে যে সব আইন চলছিল, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছিল যুক্তিহীন। মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হল। অনেক দণ্ডবিধির কঠোরতা সংশোধন করে সেগুলোকে লঘু করা হল।

দ্বিতীয় পাঠ | তাং যুগের সংস্কৃতি

তাং বংশ প্রায় তিনশো বছর চীনে রাজত্ব করেছিল। এই সময় চীনের নানা দিকে যথেষ্ট উন্নতি হয়। অনেকের মতে এই তিনশো বছরই ছিল চীনের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ যুগ।

তাং যুগ হল চীনা কাব্যের স্বর্ণযুগ। তাই সুঙের সময়ের কবিরাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সম্মানিত ছিলেন। তুফু এবং লিপো এই সময়ের শ্রেষ্ঠ দুজন কবি। হাং চাও শহরের শাসনকর্তা পো চুইও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। বেশীর ভাগ কবিই বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। অনেকে লিপোকে চীনের শ্রেষ্ঠ কবি বলে থাকেন। তাঁর কবিতায় বিষাদের সুর পাওয়া যায়। অন্য কবিরা প্রকৃতিকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন। চীনা কবিতা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করা ছিল খুবই কষ্টের কাজ। এতে অনেক সময় মূল কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত। হান উ নামে তাং যুগে একজন দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। আর একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন জাং জি হো।

ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায় সম্রাট তাইসুঙ্ অনেক অর্থ খরচ করেছিলেন। বিজ্ঞান-চর্চাতেও চীনের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা

যায়। এই সময় চীনারা বারুদ ও কাগজের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তাইসুঙের চেষ্টায় পারসিক ও খৃস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো চীনাভাষায় অনুবাদ করা হয়। সম্রাট তাইসুঙ্ হিউয়েন সাঙকে তাঁর ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। চীনের গ্রন্থগারে অনেক পুঁথিপত্র ছিল। তার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক পুঁথি হিউয়েন সাঙ্ ও ইৎ সিং ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই চীনাভাষায় অনুবাদ করা হয়। হিউয়েনসাঙ্ ৭৪টা পুঁথি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সম্রাট তাইসুঙ্ নিজের রাজপ্রাসাদে একটা বিরাট গ্রন্থাগার গড়েছিলেন। মিন্ হুয়াঙ্ নামে এই বংশের আর এক সম্রাট 'হান্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। তিনি সংগীত-শিক্ষার জন্যে একটা ইস্কুলও বসান। মিন্ হুয়াঙের দরবারে আনক বিখ্যাত কবি ও শিল্পী ছিলেন। আগে কাঠের হরফে, পরে ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভাল অক্ষরে ছাপার কাজও আরম্ভ হয়।

চা প্রথমে চীনে চালু হয়। পরে এটা একটা শিল্প হয়ে দাঁড়ায়। তারপর চীন থেকে এই শিল্প ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অতিথিদের আপ্যায়ন করতে চা-পান একটা বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় রেশম ও পশম শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল।

তাং যুগে দেশে শান্তি থাকায় শিল্পকলারও উন্নতি হয়। চিত্র-শিল্পে চীনাদের খুব খ্যাতি ছিল। চা-পান করার পাত্রগুলো ছিল অপূর্ব। চীনামাটির শিল্প ও জেড পাথরের ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ তৈরিতে চীনারা খুব পটু ছিল। মানুষের রোজকার ব্যবহারের জিনিষপত্র তৈরি ও সেগুলোর উপর রঙতুলি দিয়ে আঁকা ছবিগুলো ছিল অপূর্ব। গালা ও ব্রোঞ্জের কাজেও চীনারা যথেষ্ট দক্ষ ছিল। এই ধরনের জিনিষপত্র দেখে চীনা শিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় পাঠ

ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, ধর্ম ও চীনা সভ্যতার প্রসার

তাং যুগে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাইস্থঙের রাজত্বকালে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার হয়। চীনারা নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাং বংশের রাজাদের সময় চীনা নাবিকেরা সমুদ্রে পাড়ি দিতে "জাঙ্ক" নামে এক ধরনের ছোট জাহাজ ব্যবহার করত। এই জাহাজে করে চীনারা ভারতমহাসাগর দিয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে ব্যবসা করে বেড়াত। বাণিজ্য করে তারা দেশে যথেষ্ট ধনসম্পদ নিয়ে আসত। ফলে দেশে ধনসম্পদের অভাব একেবারেই ছিল না। বিদেশীরা যাতে এখানে এসে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তার জন্যে বিশেষ আইন করা হয়েছিল। কৃষির উন্নতির জন্যে অনেক খাল কাটা হয়েছিল।

ধর্মের ব্যাপারে চীনারা খুবই উদার ছিলেন। তাইস্থঙের সময় অনেক ধর্মই চীনে প্রচলিত ছিল। তাঙ বংশের গোড়ার দিকে চীনে খৃস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল। অবশ্য খৃস্টধর্ম চীনে একটু দেরিতে গেছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের বেলায় দেরি হয়নি। হজরৎ মহম্মদের জীবিত কালেই ইসলাম ধর্ম চীনে গিয়েছিল। তখনকার চীনা সম্রাট দুটো ধর্মের প্রতিনিধিদেরই সমাদর করেছিলেন। আরবরা ক্যাণ্টন শহরে তেরশো বছর আগে একটা মসজিদ তৈরি করেছিল। এছাড়াও চীনে আরও দুএকটা ধর্ম-বিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে চীনে যত রকমের ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রধান।

বৌদ্ধধর্ম চীনে অনেক আগেই গিয়েছিল। তাং যুগে ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু চীনে গিয়েছিলেন। এবং চীন থেকেও অনেক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন। এই সময়েই হিউয়েনসাঙ ভারতে এসেছিলেন। ভারবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে

যাচ্ছিল। অন্যদিকে চীনে তাং রাজাদের উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হচ্ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চীনে যাবার এটাও একটা কারণ মনে করা হয়। চীনের লো-ইয়াং প্রদেশেই প্রায় তিন হাজার ভারতীয় বৌদ্ধ তখন থাকতেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিল্পকলাও চীনে প্রসার লাভ করেছিল। তবে তাং বংশের রাজত্বের শেষ দিকে বিদেশী ধর্মগুলো রাজার আদেশে কিছুদিনের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এর ফলে একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ছাড়া বাকী সব ধর্মের প্রভাব একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম চীনের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

চীনা সভ্যতার প্রসারঃ চীনের সভ্যতা চীন থেকে কোরিয়াতে এবং জাপানে গিয়েছিল। তবে জাপানে অনেক পরে যায়। এই সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধধর্মও কোরিয়া এবং জাপানে ছড়িয়ে পড়ে চীনের পথ ধরে। যীশুখৃস্টের অনেক আগেই নির্বাসিত চীনারা চোজ্‌নেতে গিয়েছিল। এই চোজ্‌নই হচ্ছে কোরিয়া। এর পর অনেক চীনা ঔপনিবেশিকরা সেখানে বসবাস করেছিল। ফলে চীনের সঙ্গে এদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চীনের শিল্প, কৃষিবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতি চীনাদের সঙ্গে চোজ্‌নেতে এসেছিল। স্থাপত্যশিল্পে কোরিয়া চীনকে অনুসরণ করল। কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ছিল, সেইজন্যে বৌদ্ধধর্ম ও চীনের সভ্যতা জাপানে গিয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, কোরিয়া ও জাপান চীন-সভ্যতার সন্তান।

চতুর্থ পাঠ | হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ ও তার গুরুত্ব

হিউয়েন সাঙ্‌ চীনের হোনান প্রদেশের লোক। তিনি ৬২৯ খৃস্টাব্দে ভারতে যাবার জন্যে চীন ছেড়ে বের হন। তাঁর সময়ে

চীনে তাং বংশের রাজা তাইস্যুঙ্ এবং ভারতে পুষ্যভূতি বংশের রাজা হর্ষবর্ধন রাজত্ব করতেন। যখন তিনি ভারতে আসার জন্যে চীন থেকে বের হন, তখন চীন দেশ থেকে কারও বাইরে যাবার নিয়ম ছিল না। সেইজন্যে তিনি লুকিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং অনেক বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙ্ তাইস্যুঙের রাজধানী সিয়ান-ফু থেকে যাত্রা শুরু করেন। পামীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে তিনি যাওয়া-আসা করেছিলেন। কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। তিনি উত্তর দিক থেকে এসে গোবি মরুভূমি পার হন। পথে তাঁর সঙ্গীরা কেউ মারা যান, কেউবা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। গোবি মরুভূমি পার হয়ে তিনি তিএনশান পাহাড়ের কাছে পৌঁছান। তিএনশান পাহাড় পার হয়ে তিনি তিএনশন রাজ্যে যান। সেখান থেকে তুরফান রাজ্যে যান। তুরফান থেকে কুচানগরে গেলেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি তুর্ক-রাজ্যও ভ্রমণ করেছিলেন। এর পর হিউয়েন সাঙ্ এলেন সমরকন্দে। সমরকন্দ থেকে কাবুল, সেখান থেকে কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান।

তিনি ফেরার পথে দক্ষিণ দিক দিয়ে ফিরে যান। পামীর পার হয়ে আফগানিস্থান থেকে কাশগড়ে যান। সেখান থেকে তিনি তাঁর আসার রাস্তা ধরে দেশে ফিরে যান।

গুরুত্ব ঃ হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তিনি ভারতে না এলে আমরা তাঁর লেখা ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত সি-ইউ-কি বই পেতাম না। এই বই থেকে কেবল যে সে সময়কার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে পারি তা নয়—যেসব পথ দিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন, সেইসব পথে সে সময়ে যে বড় বড় শহর ও সভ্যতা ছিল, তার বিবরণও আমরা পাই। বিশেষ করে মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে। মধ্য এশিয়ার সভ্যতায় যে ভারতীয় প্রভাব কতখানি ছিল, তাও আমরা জানি তাঁরই লেখা বই থেকে।

চীনের ওপরেও হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।

হিউএন সাং ভারত আগমন ও প্রত্যাবর্তনের
পথ নির্দেশ
আরল হ্রদ
বোখারা
সমরখন্দ
তাসখন্দ
কাশগড়
ইয়ারখন্দ
কুচা
জারিন নং
খোটান
খাইবার গিরিপথ
পুরুষপুর
তি ব্ব ত
চীনের প্রাচীর
হোয়াংহো নং
সিগনান (চাংআন)
চী ন
ইয়াংসিকিয়াং নং
থানেশ্বর
হিমালয় পর্বত
কনৌজ
উজ্জয়িনী
নালন্দা
বলভী
নর্মদা নং
তাম্রলিপ্তি
বাতাপী
কাঞ্চি
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
আনাম
কাম্বোডিয়া
উঃ
দঃ
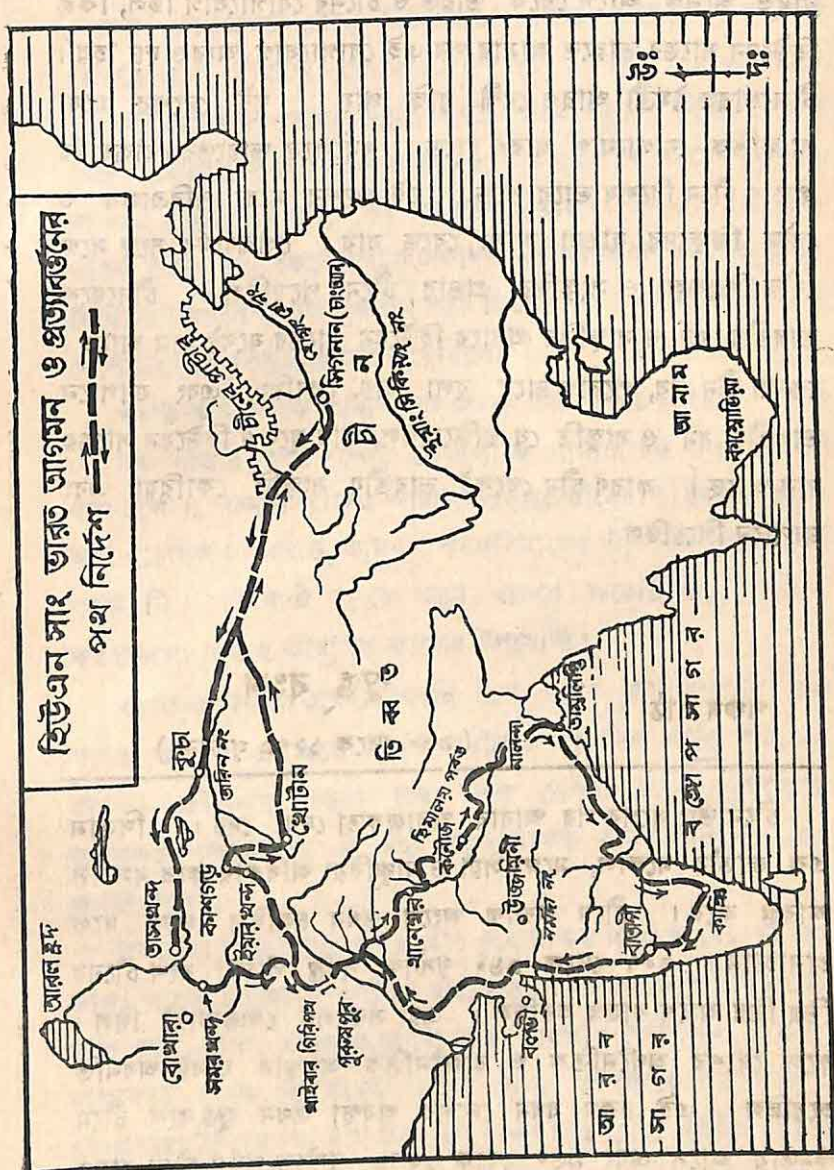
যদিও অনেক আগে থেকে ভারত ও চীনের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু হিউয়েন সাঙের ভারতে আসার পর এই যোগাযোগ আরও দৃঢ় হয়। চীন-ভারত মৈত্রী আরও বেশী বৃদ্ধি পায়। তুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও বাড়ে। ধর্মক্ষেত্রে ভারতের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চীনে বিশেষ ভাবে পড়ে। তুই দেশের মধ্যে পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যাওয়া আসা বেড়ে যায়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রভাব চীনে পড়েছিল। চীনদেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে হিউয়েন সাঙের যথেষ্ট দান আছে। কেবল চীন নয়, পরোক্ষভাবে বলা যায়, কোরিয়া এবং জাপানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যে ছড়িয়েছিল, তার মূলেও হিউয়েন সাঙের দান আছে। কারণ চীন থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি কোরিয়া এবং জাপানে গিয়েছিল।

পঞ্চম পাঠ

সুঙ্ বংশ

(৯৬০ থেকে ১২৭৯ খৃস্টাব্দ)

চীনে তাং যুগের পর আবার অরাজকতা দেখা দেয়। খিতান এক জাতীয় মঙ্গোল, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে বসবাস আরম্ভ করে। চীনে অন্যান্য অংশে তখন চলছিল দলে দলে হানাহানি। ৯০৭ থেকে ৯৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটা বংশ চীনের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করছিল। এরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী ছিল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল। এই রকম যখন দেশের অবস্থা তখন সুঙ্ বংশ চীনে ক্ষমতায় আসে এবং ৯৬০ থেকে ১২৭৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করে। চীনে আবার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আনুমানিক ১১০০ খৃস্টাব্দ সুঙ্ রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ সময়।

সুঙ্ রাজারা ছিলেন শান্তিপ্রিয়। তাঙ্ রাজাদের মত এঁরা

সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। হান এবং তাং আমলের চেয়ে এই সময় দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিকে রাজ্যের ভেতরে এবং সীমান্তে গোলোযোগ লেগেই ছিল। এইসবের প্রতিকার না হলে দেশের উন্নতি হতে পারে না। কিন্তু কোনও কিছু পরিবর্তন করাও সহজ কাজ নয়। অবশ্য ঠিক সময়ে পরিবর্তন না হলে একদিন নিজে থেকেই সব পাল্‌টে যায়। যাই হোক, এই-ভাবে কিছু সময় কেটে গেলে একাদশ শতাব্দীতে একজন সুঙ্‌ রাজা সিংহাসনে বসেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ওয়াঙ্‌-আন্‌-শি। তিনি দেশের অনেক কিছুই সংস্কার করেছিলেন।

ওয়াঙ্‌-আন্‌-শিকে সাম্যবাদের জনক বলা যেতে পারে। তিনি যে সব সংস্কার করেছিলেন, সেগুলোকে সাম্যবাদের ওপর পরীক্ষা বলা চলে। কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ অনুসারে চীনের শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। ওয়াঙ্‌-আন্‌-শি কনফুসিয়াসের আদর্শের বিরোধিতা করেন নি। তিনি ঐ মতের নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর কতকগুলো সংস্কার আধুনিক কালের উপযোগী।

ওয়াঙ্‌-আন্‌-শির প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল গরীব জনসাধারণের কর লাঘব করা। এই জন্যে তিনি ধনীদের সম্পত্তির ওপর আয়কর বসান। এই সময় খাজনা বাবদ শস্য নেওয়া হত। প্রত্যেক প্রদেশের শস্যগোলায় ঐ শস্য মজুত থাকত যাতে দুর্ভিক্ষের সময় কাজে লাগে।

কৃষকেরা মহাজনদের কাছে ঋণে ডুবে থাকত এবং তাদের বেশীর ভাগ আয়ই মহাজনের বাড়ীতে জমা পড়ত। অথচ তারা এর থেকে মুক্তি পেত না। ওয়াঙ্‌-আন্‌-শি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। রাজকোষ থেকে কৃষকদের চাষের সময় ঋণ দেবার ব্যবস্থা হল। মহাজনেরা ঠকিয়ে কম দাম দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে জিনিষ নিয়ে নিত। সেইজন্যে কৃষকদের উৎপন্ন জিনিষ কিনতে সরকারী দোকান খোলা হল। বাজার-দর কমলে চাষীদের ক্ষতি হয়। যাতে বাজার দর ওঠানামা না করে, সেই কারণে দর বেঁধে দেওয়া হল। প্রত্যেক

লোককে তার কাজের জন্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করা হল। বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে খাটানো হতনা। কৃষিকাজে ঘোড়ার অভাব হওয়ায় ওয়াঙ্ গরু ও মোষের দ্বারা ঐ কাজ করিয়ে নিতেন। কারণ ঘোড়া তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগত। ওয়াঙ্ একটা সামরিক বাহিনীও গড়ে ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব সংস্কার বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ সুঙ্ যুগের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। আগেই ছাপার কাজ আরম্ভ হওয়ায় বই সুলভে পাওয়া যেত। দেশে পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারও হয়েছিল। কাব্য পড়ার ঝোঁক বেড়ে গিয়েছিল। তবে এই সব কাব্য বৌদ্ধধর্মের ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে চর্চা করা হত। কনফুসিয়াসের চিন্তাধারার নতুন করে ব্যাখা করা হয়েছিল।

শিল্প ঃ এইযুগে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সুঙ্ শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকতে বিশেষ পটু ছিলেন। কাগজ অথবা সিল্কের বিশেষ ধরনের কাপড়ের ওপর ছবি আঁকা হত। এগুলো অনেকটা ব্লটিং কাগজের মত হওয়ায় তাড়াতাড়ি রঙ শুষে নিত। ফলে ছবি আঁকতে শিল্পীদের সুবিধা হত। গোড়ার দিকে বড় বড় দার্শনিক ও মহাপুরুষের ছবি আঁকা হত। পরে বুদ্ধের জীবনের বিশেষ ঘটনা নিয়ে শিল্পীরা ছবি আঁকত। ফুল ও প্রাকৃতিক দৃশ্য চীনা-শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে চিত্রশিল্পীদের ছবি আঁকাটা পেশা ছিলনা। একমাত্র পেশা ছিল অভিনয়। শিল্পীরা বাঁশের চোঙের ওপর রঙ-তুলি দিয়ে সুন্দর কাজ করত। অনেক ভালো ছবি কেবল কালি দিয়েই এই সময় আঁকা হয়। এই সময় পোর্সিলিন বা চীনা মাটির বাসন তৈরি হয়। এই বাসনগুলোর ওপর চীনা-শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন।

ষষ্ঠ পাঠ | মঙ্গোলদের কথা

উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় মধ্য এশিয়াতে মঙ্গোলরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের আদি বাসভূমি ছিল মঙ্গোলিয়ার উত্তরে। প্রথমে তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত। মাংস ও ঘোড়ার দুধ ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। পশুপালন ও শিকার ছিল তাদের পেশা। এরা ছিল ভালো যোদ্ধা এবং তীর ধনুকের ব্যবহারে খুবই নিপুণ।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে **চেঙ্গীস খাঁর** অধীনে তারা শক্তিশালী ও একতাবদ্ধ হয়। তিনি একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে চীনের প্রাচীর পার হয়ে চীনের অনেক অংশ জয় করেন। তারপর চেঙ্গিস খাঁ একে একে কাশগড়, বুখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি নগর জয় করে ধ্বংস করেন। তিনি ভারতের সিন্ধু-নদ পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর শত্রুকে দাসবংশের সুলতান ইলতুৎমিস আশ্রয় না দেওয়াতে চেঙ্গিস ফিরে যান। সমরকন্দ জয়ের পর মঙ্গোলেরা দক্ষিণ রাশিয়া জয় করে। খুব নিষ্ঠুর হলেও চেঙ্গিস কিন্তু বর্বর ছিলেন না। তিনি নাকি কবিতা লিখতে পারতেন। দেশে আইন-কানুন তৈরি করে শাসন করতেন। সব ধর্মের লোকেরা তাঁর রাজ্যে অবাধে বাস করত। বিশিষ্ট চীনা পণ্ডিত চুসাই তাঁর মন্ত্রী ছিলেন।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর মঙ্গোল রাজ্য আরও বেড়ে যায়। তাঁর ছেলে ওগদাই খাঁ সমস্ত রাশিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী জয় করেছিলেন তাঁর সেনাপতি সাবুতাইয়ের দ্বারা। চেঙ্গিসের এক নাতি হুলাগু বাগদাদ নগর জয় করে তাকে ধ্বংস করেন। ওগদাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় ইউরোপ রক্ষা পায়। ওগদাই মারা গেলে কে খাখন অর্থাৎ সম্রাট হবেন তার সমস্যা দেখা দিল। এদিকে আবার মঙ্গোলেরা চীনেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। ১২৫২ খৃস্টাব্দে অবশেষে মঙ্গু খাঁ সম্রাট হয়ে ভাই কুবলাই খাঁকে চীনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মঙ্গু খাঁ মারা গেলে কুবলাই খাঁ সম্রাট হন।

সপ্তম পাঠ

ইউনান বংশ

[খৃঃ ১২৮০—১৩৬৮]

কুবলাই খাঁ ঃ ১২৬০ খৃস্টাব্দে কুবলাই খাঁ মঙ্গোলদের 'খাখন' হন। চেঙ্গিসের বংশধরদের মধ্যে কুবলাইয়ের খ্যাতি সবচেয়ে বেশী। ইনি খাখন হওয়ার আগেই অনেক দিন চীনে ছিলেন। চীনের এক মনীষীর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। সেইজন্যে মনে প্রাণে তিনি চীনা হয়ে গিয়েছিলেন। চীনারাও তাঁকে নিজেদের লোক মনে করত। কুবলাই চীনে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম ছিল **ইউনান বংশ**।

কুবলাই খাঁ সুঙ্ রাজাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন। সমস্ত চীন তাঁর অধিকারে আসে। তিনি তাঁর রাজধানী কারাকুরম থেকে পিকিঙে উঠিয়ে নিয়ে যান। চীন সম্রাটের অনুকরণে তিনি স্বর্গপুত্র উপাধি নিয়েছিলেন। টঙ্কিঙ্, আনাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। জাপান ও মালয়দেশ জয়ের চেষ্টাও কুবলাই করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। কেননা মঙ্গোলেরা সমুদ্রে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিল না। কুবলাই খাঁর একভাই হুলাগু এই সময় বাগদাদ নগর জয় করে ধ্বংস করেছিলেন।

কুবলাই খাঁ

এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে মঙ্গোল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এতবড় বিরাট সাম্রাজ্য কোন কালে ছিলনা। মঙ্গোলরা যেন পৃথিবীর রাজা ছিল। একমাত্র পশ্চিম ইউরোপ তাদের দয়ায় বেঁচে ছিল। আর ভারতবর্ষে তাদের পথে পড়েনি তাই রক্ষা পেয়েছিল।

অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অবস্থাটা সেই রকম ছিল। ১২৯৪ খৃস্টাব্দে কুবলাই খাঁ মারা যান। তারপর এই ইউনান বংশও বেশী দিন থাকেনি। কুবলাইয়ের সাম্রাজ্য পাঁচটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

(১) মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং তিব্বত নিয়ে হল চীন সাম্রাজ্য এই অঞ্চলে কুবলাই খাঁর বংশধরেরা শাসন করতেন।

(২) রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠল একটা আলাদা সাম্রাজ্য।

(৩) পারস্য, মেসোপটেমিয়া ও মধ্য এশিয়াতেই কুবলাইয়ের ভাই হুলাগু ইল্‌খান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

(৪) মধ্যএশিয়ার তুরস্কে গড়ে উঠল জগতাই সাম্রাজ্য।

(৫) সাইবেরিয়া-সাম্রাজ্য।

অষ্টম পাঠ | মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

মঙ্গোলদের রাজধানী কারাকুরাম নগরের খুব নাম ডাক ছিল। মঙ্গোলদের জ্ঞানলাভের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাদের উৎসাহেই দেশবিদেশ থেকে রাজসভায় অনেক ভ্রমণকারী আসত। পিকিঙ্‌ নগরে কুবলাই খাঁর রাজসভায় ভেনিস শহর থেকে নিকলো পোলো ও মফিয়ো পোলো নামে দুইভাই এসেছিলেন। তাঁরা কুবলাই খাঁকে ইউরোপ ও খৃস্টধর্মের কথা শোনান। কুবলাই খাঁ ১২৬৯ খৃস্টাব্দে পোলোভ্রাতৃদ্বয়কে ইউরোপে ফেরৎ পাঠান খৃস্টধর্মে জ্ঞান আছে এমন একশো জন বিদ্বান লোককে তাঁর কাছে পাঠাতে। বছর দুই বাদে তাঁরা দুজন খৃস্টান সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে পিকিঙের দিকে রওনা হন। এবার সঙ্গে গেলেন নিকলো পোলোর যুবক ছেলে মার্কোপোলো। পোলোরা প্রায় ১৬ বছর চীনে ছিলেন।

ভ্রমণ পথ ঃ সমস্ত এশিয়া তাঁরা হাঁটাপথে পার হয়েছিলেন। তাঁদের ভ্রমণপথটা ছিল এইরকম—প্যালেস্টাইন হয়ে প্রথমে আর-মেনিয়া, তারপর মেসোপটেমিয়া এবং পারস্য উপসাগর। পারস্য পার হয়ে বল্‌খ্ এবং পর্বতমালা পার হয়ে খাশগর, তারপরে খোটান ও লপ্‌নর হ্রদ্, এরপর আবার মরুভূমি পার হয়ে চীনদেশ এবং পিকিঙ্। ফেরার পথে পোলোরা চীন থেকে জলপথে যাত্রা করে, সুমাত্রার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে আসেন। তারপর দক্ষিণ ভারতের কয়াল বন্দর থেকে পাড়ি দিয়ে তাঁরা দু বছর পরে পারস্যে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে নিজের দেশ ভেনিসে পৌঁছান ১২৯৫ খৃস্টাব্দে।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঃ মার্কোপোলো একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে চীনের কথাই বিশেষ করে বলেছেন। তাছাড়া শ্যামদেশ, জাভা, সুমাত্রা, সিংহল, দক্ষিণভারত প্রভৃতি দেশের কথাও লিখেছেন। মার্কোপোলো চীনের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। তিনি কুবলাই খাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কুবলাই খাঁ শিক্ষিত ও উদার ছিলেন। সকল ধর্মের প্রচারকই তাঁর কাছে আসতেন। সম্রাট মজা করে বলতেন, সকলের মিলিত প্রার্থনায় স্বর্গে তাঁর আসন পাকা হবে। কুবলাই খাঁর রাজপ্রাসাদের নাম ছিল খান্‌বলিক। ঘরের দেওয়ালগুলো ছিল খুবই সুন্দর—দেওয়াল-গুলোতে ছবি আঁকা থাকত। সম্রাটের চার রাণী ছিলেন—বড় রাণীর নাম ছিল জমুই খাতুন। প্রাসাদের বাগানে অনেক পশুপাখী ঘুরত, চিতাবাঘও ছিল। প্রাসাদে উৎসব লেগেই থাকত।

সম্রাট মার্কোপোলোকে হ্যাঙ্‌চাউ শহরের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন। এই নগরের রাস্তাগুলো ছিল চওড়া। নগরের মধ্যে অনেক চওড়া খাল ছিল। খালের ওপর যাতায়াতের জন্যে প্রায় ১২০০০ সেতু ছিল। রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ী ও শহরের মধ্যে দশটা বড় বড় বাজার ছিল। অনেক দোকান-পাট, ভারতীয় বণিকদের পাথরের গুদাম-ঘর, জনসাধারণের জন্যে স্নানের ঘর,

সোনার কাজকরা রেশমী কাপড় এবং নানা ধরনের আশ্চর্য জিনিষ-পত্র হ্যাঙ্‌চাউ শহরে পাওয়া যেত। এই শহরটি মার্কোর দেশ, ভেনিসের মতই সুন্দর ছিল। মার্কোপোলো ব্রহ্মদেশের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার বিশাল সৈন্য বাহিনী ও হাজার হাজার যুদ্ধের হাতীর কথা লিখেছেন। জাপানের অশেষ ধনসম্পদের কথা মার্কোর বিবরণে পাওয়া যায়। তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষের যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা লেখা আছে। পোলোরা স্বদেশে ফেরার পথে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। সেখানে তাম্রপর্ণী নদীর ওপর পাণ্ড্যরাজ্যের কয়াল বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখে তাঁরা অবাক হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের এক বড় রাণীর কথা তিনি লিখে গেছেন। তাঁর নাম রাণী রুদ্রাম্মা। ইনি কাকতীয় বংশের রাণী ছিলেন। মার্কোরাণী রুদ্রাম্মার বীরত্বের খুব প্রশংসা করেছেন। এই রাণী শৃঙ্খলার সঙ্গে দেশ শাসন করতেন। মার্কোই প্রথমে 'ক্যাথে' বা চীনের সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির খবর ইউরোপকে শুনিয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী পরবর্তী কালে কলম্বাস প্রভৃতি নাবিকদের দেশ আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করেছিল।

(খ) জাপান

প্রথম পাঠ | জাপান ও সামন্ততন্ত্র

জাপানের ইতিহাস কি ভাবে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। জাপানের ইতিহাস শুরু হয় চীনের অনেক পরে, এমনকি কোরিয়ার ইতিহাস শুরু হওয়ার পরে। তবে একথা বলা অন্যায় হবে না যে, কোরিয়া এবং জাপান চীন সভ্যতার সন্তান। জাপানীদের পূর্ব-পুরুষেরা কোরিয়া বা দক্ষিণ মালয়েশিয়া থেকে

এসেছিল। চীনের অত্যন্ত কাছে থাকায় জাপানীদের ওপর চীন সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। এমনকি শাসনতন্ত্রের ওপরও চীনের প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু সব কিছুকেই জাপানীরা নিজেদের মত করে নিত। চীনা শাসনতন্ত্রকেও তারা নিজেদের মত করে নিয়েছিল।

প্রথম দিকে জাপানে অনেকগুলি শাসক-পরিবার বা গোষ্ঠী ছিল। এই সব গোষ্ঠীর একজন সাধারণ কর্তা থাকত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর অধীনে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত গোষ্ঠী ছিল এবং সেইসব গোষ্ঠীর লোকেরা সামাজিক দিক থেকে শাসক-পরিবার বা গোষ্ঠীর চেয়ে নীচু স্তরের ছিল।

চীনা শাসনতন্ত্রকে জাপানীরা নিজেদের মত করে নিয়েছিল ঠিক; কিন্তু তাও বেশীদিন চলল না। এখানেও উদ্ভব হল সামন্ততন্ত্রের। এই সামন্ততন্ত্র ছিল অদ্ভুত ধরনের। এর দুটো ভাগ ছিল—একভাগ গড়ে উঠেছিল সম্রাটকে কেন্দ্র করে, অন্যটা গড়ে ওঠে যারা প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসন চালাত সেই সামরিক সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তারা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। এদের মধ্যে যাদের প্রভাব বেশী ছিল, তারা কোনও রকমের কর দিত না। তাদের মধ্যে আবার অনেকে ব্যক্তিগত জমি ভোগ করত। এর ফলে সেগুলো চাষীদের মধ্যে ভাগ করা হতনা। এধরনের ব্যক্তিগত জমিকে শো বা শোয়েন (Sho বা Shoen) বলা হত। এগুলো ইউরোপের ম্যানরহাউসের মত। যারা শোয়েনের মালিক ছিল তারা চেষ্টা করত যাতে কর দিতে না হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা কর দিত না। সরকারী কর্তৃত্বের বাইরে থাকতেও তাদের চেষ্টার অন্ত ছিলনা। যারা ঐ রকম করতে পারত, প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল স্বাধীন। এদের এক একটি ক্ষুদ্র রাজা বল্‌লেও ভুল হবে না।

শোয়েনগুলো অনেক ভাবেই গজিয়ে উঠত। কতকগুলো মন্দির বা মঠের সম্পত্তি ছিল। এই জমির জন্যে কোন কর দিতে

হত না। সেইজন্যে এগুলো সরকারী আওতার বাইরে ছিল। অনেক সময়ে বিশেষ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনেককে সরকার থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে জমি দেওয়া হত। কিন্তু মেয়াদ শেষ হলেও তারা আর জমি ফেরত দিত না। দেখা গেছে পতিত জমি লোকে চাষ-আবাদের জমিতে পরিণত করে নিত এবং সেগুলো ক্রমে ক্রমে শোয়েনে পরিণত হত।

আনুগত্যের শপথের দরুণও শোয়েনের সৃষ্টি হয়। এই আনুগত্য অনেক ধরনের হত। যেমন, যারা কর দিচ্ছে তারা, যারা কর দিচ্ছে না এই ধরনের শোয়েনের মালিকের কাছে তাদের জমি সঁপে দিত। এর জন্যে যার জমি, সে জমির চাষ আবাদ করতে পারত। কিন্তু পরিবর্তে তার উৎপন্ন শস্যের ভাগ অপরকে দিতে হত। ফলে জটিলতা বেড়ে যায়। আরও নানা ভাবে শোয়েন গজিয়ে উঠেছিল। দিন দিন ব্যাঙের ছাতার মত শোয়েন বেড়ে যেতে লাগল। এই জন্যে শোয়েন যাতে না বাড়ে তার চেষ্টা চলত। কারণ শোয়েন বাড়লেপর রাজস্বের ক্ষতি হত এবং এই সবের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত না। এর ফলে অনেক ক্ষমতাশালী পরিবার এবং সঙ্ঘের সৃষ্টি হল। শোয়েনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা কার্যকর হল না। শোয়েন বেড়েই চলল এবং সরকারের ক্ষমতা কমতে লাগল।

দ্বিতীয় পাঠ | চীনের সহিত সম্পর্ক

আদিযুগে জাপানের নাম ছিল যামাতো বা ইয়ামাতো। কোরিয়ার সঙ্গে ইয়ামাতোর একটা সম্পর্ক ছিল। অপর দিকে চীনের সঙ্গে কোরিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেইজন্যে চীনা-সভ্যতা ইয়ামাতো রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। মোটামুটি ভাবে

বলা যায় চীনে যখন হান বংশের রাজত্বকাল তখন থেকেই জাপান ও চীনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাপানীরা হানরাজাদের দরবারে আসত এবং চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। কিন্তু হানবংশের পর থেকে সুই ও তাঙ্ বংশের উত্থান পর্যন্ত চীনের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ অনিয়মিত ছিল। চীনে সুই এবং তাঙ্ যুগের সময় থেকেই জাপানের সঙ্গে চীনের যোগা-যোগ ঘনিষ্ঠ হয়। এই সময় অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। জাপানীরাও বেশী সংখ্যায় চীনে যাতায়াত শুরু করে। চীন থেকে বণিক, শিল্পী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা জাপানে যান। এঁদের দ্বারাই চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। জাপানীরা নিজেদের মত করে নিয়ে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। তবে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিজেদের মত করে নিতে জাপানীদের কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল।

ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চীনারা জাপানীদের কাছ থেকে অনেক কিছূই নিয়েছিল। চীনা বই এবং কনফুসিয়াসের রচনা জাপানী শিক্ষাতে স্থান পেয়েছিল। জাপানীদের প্রথম দিকে নিজেদের বর্ণমালা ছিল না। তারা চীনা বর্ণমালা ব্যবহার করত। ক্রমে জাপানীরা চীনা বর্ণমালাকে সহজ করে নিজেদের বর্ণমালার সৃষ্টি করে। কিন্তু চীনা বর্ণমালা থেকে সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। ধীরে ধীরে জাপানীরা নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করে, ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। শাসনতন্ত্র এবং ধর্মের ব্যাপারেও জাপানের ওপর চীনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। কথিত আছে, কোরিয়ার মধ্য দিয়েই জাপানে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করে। কোরিয়ার পাক্‌চী রাজ্যের শাসনকর্তা ইয়ামাতোর রাজার কাছে ৫২২ খৃস্টাব্দে একটি সোনার বৌদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ ও কয়েকজন ধর্মপ্রচারককে জাপানে পাঠান। জাপানে যে শিল্পের উন্নতি, তার মূলে এই বৌদ্ধধর্ম।

জাপান নামটাও একদিক দিয়ে চীনাদের দেওয়া। কোন এক চীন সম্রাট জাপানের এক শাসনকর্তাকে "তাই-নিক্-পুং-কোক্" অর্থাৎ সূর্যোদয়ের বিরাট রাজ্যের সম্রাট বলে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তারপর থেকে জাপানীরা নিজেদের দেশকে ইয়ামোতো না বলে "দাই নিপুন" অর্থাৎ "সূর্যোদয়ের দেশ" বলত। এখনও জাপান এই নামে পরিচিত। "জাপান" নামটা নিপুন শব্দ থেকে এসেছে। দেশের নামকরণে যেমন চীনা প্রভাব পড়েছে, তেমনি জীবনের সব ক্ষেত্রেই জাপানীদের ওপর চীনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। সভ্যতায়, শিল্পে, ধর্মে জাপান চীনের কাছে ঋণী ; কিন্তু পরবর্তী কালে চীনকে ধ্বংস করে সে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছিল।

তৃতীয় পাঠ | মিকাডো, সিণ্টোধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

জাপানে প্রচলিত ধর্মের নাম ছিল সিণ্টোধর্ম। সিণ্টো কথাটা চীনা—এর মানে হচ্ছে দেবতাদের পথ। সিণ্টোধর্ম ছিল প্রকৃতি-পূজা আর পূর্ব-পুরুষপূজা এই দুয়ের মিশ্রণ। এই ধর্মে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন বা সমস্যার কোনও স্থান ছিল না। সিণ্টোধর্ম ছিল প্রধানতঃ যোদ্ধাজাতির ধর্ম। এর মূল কথা ছিল, দেবতাদের পূজো কর এবং তাদের বংশধরদের প্রতি অনুগত থাকো। জাপানে যখন প্রথমে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছাল প্রাচীন সিণ্টোধর্মের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। কিন্তু বিরোধ মিটতে দেরি হল না। তারপর থেকে দুটো ধর্মই আজও পাশাপাশি চলছে। কিন্তু সিণ্টোধর্মই বেশী জনপ্রিয়। কারণ সিণ্টোধর্মকে শাসক শ্রেণী সমর্থন করে এবং সিণ্টোধর্ম জনসাধারণকে তাদের প্রতি অনুগত থাকতে বলে।

জাপানীরা তাদের সম্রাটকে মিকাডো বলত। মিকাডোকে

সর্বশক্তিমান বলে মনে করা হত। মিকাডো ছিলেন একাধারে দেবতা ও সূর্যের বংশধর। সিন্টোধর্ম জাপানীদের শিখিয়েছে সম্রাটের একাধিপত্য মেনে নিতে, দেশের ক্ষমতাশালী লোকদের প্রতি অনুগত থাকতে। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে জাপানে সম্রাটের কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রকৃত ক্ষমতা থাকত প্রভাবশালী বড়ো পরিবার কিংবা বংশের হাতে। সম্রাট তাদের হাতের পুতুল ছিলেন মাত্র।

সর্ব প্রথমে সোগা পরিবার জাপানে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। তাদের সময়েই বৌদ্ধধর্ম সরকারিধর্ম হিসাবে প্রচলিত হয়। এই বংশের শোতুকু তাইশির নাম জাপানের ইতিহাসে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং খুব ক্ষমতাশালী লোক। জাপানে তখন কুলনেতাদের খুবই প্রতাপ। কারও কর্তৃত্ব কেউ মানে না, সবাই স্বাধীন। সম্রাট ছিলেন নামমাত্র সম্রাট। শোতুকু তাইশি কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করে গড়ে তুললেন, সব সামন্তকে বাধ্য করলেন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে। এই ঘটনা আনুমানিক ৬০০ খৃস্টাব্দের। শোতুকু তাইশি মারা গেলে সোগা বংশ বিতাড়িত হল। কিছুদিন কাটলে কাকাতোমি নো-কাকাতোরি নামে একজন লোক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে চীনাশাসন পদ্ধতি আমদানি করেন। সম্রাটের হাতে এল ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় সরকার হ'ল শক্তিশালী। এই সময় নারা-নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ৭৯৪ খৃস্টাব্দে কয়েটো নগরে রাজধানী উঠিয়ে নেওয়া হয়। এরপর টোকিও হ'ল জাপানের রাজধানী। কাকাতোমি নো-কামাতোরি জাপানে যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন সেই বংশের নাম ফুজিয়ারা বংশ। তুশো বছর কাল এই বংশ জাপানে রাজত্ব করেছে। এদের দারুণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

চতুর্থ পাঠ

জাপানে শোগান-রাজত্ব

জাপানে ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় কয়েকটা বড় পরিবারের মধ্যে বিরোধ বাধে। তখন কেন্দ্রে একটা সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হয়। আগে সম্রাটের ক্ষমতা কোন একটা বড় এবং ক্ষমতাশালী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারে সম্রাটের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কেন্দ্রে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রমাণ হিসাবে নারা নগরে রাজধানী স্থাপিত হল। পরে আবার কয়েটো নগরে রাজধানী উঠিয়ে নেওয়া হয়।

ফুজিয়ারা বংশ খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। সম্রাট ছিলেন তাদের হাতের পুতুল। এই ফুজিয়ারা বংশ তুশো বছর জাপানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। শেষ পর্যন্ত সম্রাটেরা হতাশ হয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে মঠে চলে যান। কিন্তু সন্ন্যাসী হলেও সংসার থেকে একেবারে আলাদা হয়ে রইলেন না। পরবর্তী সম্রাটকে শাসন-কার্যে নানা পরামর্শ দিতে লাগলেন। এতে করে অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ফুজিয়ারা বংশের ক্ষমতা কমে গেল। সম্রাটেরা একজনের পর একজন মঠে গেলেন ঠিকই—কিন্তু আসল ক্ষমতা রইলো তাঁদেরই হাতে।

এদিকে দেশের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছিল। নতুন এক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হল—সামরিক শ্রেণী। এদের বলা হত দাইমো। দাইমো কথার অর্থ বড়ো নাম। দাইমোরা তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ, সৈন্যসামন্ত নিয়ে খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কয়েটোর সরকারকে মানত না। এদের মধ্যে আবার টায়রা ও মিনামতো বংশ ছিল প্রধান। ১১৫৬ খৃস্টাব্দে এদের সাহায্যে সম্রাট ফুজিয়ারা বংশকে দমন করেন। কিন্তু এর পরই টায়রা ও মিনামতো বংশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। টায়রা বংশের জয় হয়। মিনামতো বংশের চারটে শিশু

ছাড়া টায়রারা সকলকে মেরে ফেলে। এই চারজনের মধ্যে **আরিতমো** নামে বার বছরের বালক ছিল। আরিতমো বড় হয়ে টায়রা বংশের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত আরিতমো তার শোধ নিল। রাজধানী থেকে টায়রা-বংশকে তাড়িয়ে দিল এবং এক নৌ-যুদ্ধে তাদের ধ্বংস করল। তার হাতে এল প্রচুর ক্ষমতা। সম্রাট আরিতমোকে **সি-ই-তাই-শোগান** উপাধি দিলেন। এই কথার অর্থ হচ্ছে দুর্বৃত্ত-দমনকারী বীর সেনাপতি। এটা ১১৯২ খৃস্টাব্দের কথা। এই উপাধি বংশগত হয়ে দাঁড়াল। শুরু হল শোগান-রাজত্ব। শোগান-রাজত্ব জাপানে অনেকদিন চলেছিল। প্রায় ৭০০ বছর আগেও জাপানে শোগান-শাসন চলত।

আরিতমো রাজধানী কয়েটোতে থাকতেন না। তিনি থাকতেন কামাকুরা বলে একটা জায়গায়—এটা ছিল তাঁর সামরিক রাজধানী। সেইজন্যে তাঁর বংশের শাসনকালকে বলা হয় **কামাকুরা-শোগানেত**। প্রায় ১৫০ বছর এই বংশ শাসন করেছিল এবং দেশকে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেছিল। কিন্তু ক্রমে এই বংশের অবনতি হল। ফলে গৃহযুদ্ধ বাধল। সম্রাট নিজের ক্ষমতা ফিরে পেতে চেষ্টা করেও বিফল হলেন। ১৩৩৮ খৃস্টাব্দে কামাকুরা শোগানের পতন হল। এল আশিকাগা শোগানেত, যার শাসন চলেছিল ২৩৫ বছর। এই সময় চীনে মিঙ বংশ রাজত্ব করতেন। এই শোগানের একজন মিঙদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন এবং নিজেকে মিঙ-সম্রাটের সামন্ত বলে পরিচয় দিতেন। জাপানীরা এই লোকটির খুবই নিন্দা করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, এই সময়ে জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। শোগানদের সময়ে জাপান সব দিকেই উন্নতি করেছিল।

পঞ্চম পাঠ | সামুরাই ও বুসিডো

জাপানে সামন্ত প্রথার সময়ে সামরিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জমিদার বা শোয়েনের মালিকদের দস্যু তস্কর এবং অন্যের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচার জন্যে সামরিক গোষ্ঠীর দরকার হয়। বড় এবং ক্ষমতাশীল পরিবার 'দাইমো' বা বড় নাম এই ধরণের এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করল। দাইমোদের অনুচর ছিল **সামুরাই** নামে এক যুদ্ধবাজ সামরিক কর্মচারীর দল। এই সামুরাই সম্প্রদায় মধ্যযুগের ইউরোপের নাইটদের মত। সামুরাইরা তাদের গোষ্ঠী বা প্রভুর অনুগত থাকত। তরওয়াল ছিল তাদের প্রতীক, সাহস এবং প্রভুর জন্য মৃত্যু বরণ করা ছিল তাদের ধর্ম। সামুরাইরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির হত। তারা কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর খুবই অত্যাচার করত এবং প্রভুর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা যেকোনও উপায়ে রক্ষা করা ছিল তাদের ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে বুসিডোর কথা কিছু বলা প্রয়োজন। বুসিডো কোন ধর্ম নয়। বুসিডো হচ্ছে সামুরাইদের নিয়ম। সাহস, শুদ্ধ-চরিত্র, শৃঙ্খলা, শারীরিক পটুতা, প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা প্রভৃতি বুসিডোর নিয়ম। সামুরাইরা একদিকে যেমন ছিল গৌরবের পাত্র অন্যদিকে তেমনি ছিল বিপদজনক। তারা কেবলমাত্র তাদের প্রভুর অনুগত ছিল। দেশের প্রতি তাদের কোনও আনুগত্য ছিল না। মধ্যযুগে ইউরোপের শিভ্যাল্‌রি আর জাপানীদের বুসিডো প্রায় একই জিনিষ।

অনুশীলনী

[ক] চীন

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) লি পরিবারকে কোন বংশের রাজারা শাসন করেছিলেন? (খ) সুই শহর কোথায় অবস্থিত ছিল? (গ) কবি পো-চুই কোন প্রদেশের শাসনকর্তা

ছিলেন ? (ঘ) তাং বংশ কত বছর চীনে রাজত্ব করেছিল ? (ঙ) চীনের শ্রেষ্ঠ কবির নাম কি ? (চ) হিউয়েন সাঙ চীনা ভাষায় কয়টি বৌদ্ধপুঁথি অনুবাদ করেন ? (ছ) হান্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয় কে স্থাপন করেন ? (জ) হান উ কে ছিলেন ? (ঝ) সমুদ্রপাড়ি দিতে চীনারা যে জাহাজ ব্যবহার করত তার নাম কি ? (ঞ) ক্যাণ্টন শহরে আরবেরা কি তৈরি করেছিল ? (ট) কাকে সমাজবাদের জনক বলা হয় ?

২। **বন্ধনীর মধ্য হতে সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) কবি লি পোর কবিতায় — (আনন্দের সুর, বিষাদের সুর প্রকৃতির ছবি পাওয়া যায়)। (খ) জাং জিহো ছিলেন — (কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক)। (গ) চীনের — (লো-ইয়াঙ্, হোনান্, সিয়ান-ফু) প্রদেশে প্রায় তিন হাজার ভারতীয় বৌদ্ধ থাকতেন। (ঘ) হিউয়েন সাঙ চীনের — (সিয়ানফু, হোনান্, লো-ইয়াঙ্) প্রদেশের লোক। (ঙ) — (খিতান, তাতার, তুর্কী) নামে এক জাতীয় মোঙ্গল, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে বসবাস আরম্ভ করে। (চ) — (চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, সঙ্গীত) ছিল একমাত্র পেশাগত শিল্প।

৩। তাং যুগের সংস্কৃতি বর্ণনা কর।

৪। চীনাদের ব্যবসা ও কৃষিসম্পর্ককে বর্ণনা কর।

৫। হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণের বৃত্তান্তের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৬। ওয়াঙ আন্‌-শি কে ছিলেন ? তিনি যে সব সংস্কার করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দাও।

৭। সুঙ্ যুগে চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয় বর্ণনা কর।

৮। কুবলা খাঁ কে ছিলেন ? তাঁর সময়ে চীনের বর্ণনা দাও।

৯। মার্কোপোলো কে ছিলেন ? তিনি কার দরবারে চীনে আসেন ? চীন সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তার বর্ণনা দাও।

[খ] জাপান

১। **দু'এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) জাপানীদের পূর্ব-পুরুষ কোথা থেকে এসেছিল ? (খ) জাপানী শাসনতন্ত্রে কিসের প্রভাব পড়ে ? (গ) আদিযুগে জাপানের নাম কি ছিল ?

(ঘ) কে জাপানে সোনার বৌদ্ধমূর্তি পাঠিয়েছিলেন? (ঙ) 'দাই নিপুন' কথার অর্থ কি? (চ) জাপান নামটা কোথা থেকে এসেছে? (ছ) জাপানে প্রচলিত ধর্মের নাম কি? (জ) মিকাডো কাকে বলা হত? (ঝ) কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম জাপানে সরকারী ধর্ম হিসাবে পরিণত হয়? (ঞ) কাকাতোমি নো কামাতোরি জাপানে যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বংশের নাম কি? (ট) দাইমো কাদের বলা হত?

২। শোয়েন কি? কিভাবে জাপানে শোয়েন গড়ে উঠেছিল?

৩। জাপানের আদি নাম কি ছিল? কিভাবে জাপান নামের উৎপত্তি হল? জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বর্ণনা দাও।

৪। মিকাডো কাকে বলা হত? সিণ্টোধর্ম কি? সিণ্টোধর্মের মূল কথা কি?

৫। সামুরাই কাদের বলা হত? বুসিডো কি? সামুরাইদের সঙ্গে বুসিডোর সম্বন্ধ কি ছিল?

৬। বামপার্শ্বে এবং ডানপার্শ্বে কতকগুলি নাম এলোমেলো ভাবে দেওয়া আছে। যে নামের সঙ্গে যে নামের সম্বন্ধ আছে, তার জোড়া মিলিয়ে দাও।

বামপার্শ্ব	ডানপার্শ্ব
(ক) কোরিয়া	(১) শোতুকু তাইশি।
(খ) জাপান	(২) কাকাতোমি নো কামাতোরি
(গ) সোগা পরিবার	(৩) পাক্‌চী রাজ্য।
(ঘ) ফুজিয়ারা বংশ	(৪) নিপ্পুন।
(ঙ) দাইমো	(৫) মিনামতো।
(চ) আরিতমো	(৬) বড়ো নাম।

একাদশ অধ্যায়
প্রথম পাঠ

ভারতে মধ্যযুগ

(ক) গুপ্ত পরবর্তী যুগ (৫ম হইতে ৭ম শতাব্দী)

হুণ জাতি ও হুণ আক্রমণ ঃ হুণরা মঙ্গোল জাতীয় যাযাবর। এক সময় এরা মধ্যএশিয়ায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। পূর্বদিকে ছিল চীন সাম্রাজ্য, আর চীনের প্রাচীর। সেদিকে তারা যেতে পারত না। মনে হয় এই সময় মধ্যএশিয়াতে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। আর সেই সঙ্গে হুণদের চেয়ে কোন শক্তিশালী যাযাবর জাতি হুণদের আক্রমণ করলে হুণেরা তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তারা দুদলে ভাগ হয়ে একদল ভলগা নদীর দিকে এবং অন্য দল অক্ষু বা অক্সাস নদীর দিকে চলে যায়। যে দলটা অক্ষু নদীর দিকে যায় সেই দলটা পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরা হেপ্থালাইট বা শ্বেত হুণ নামে পরিচিত।

অক্ষু নদীর তীর থেকে তারা পারস্য ও ভারতবর্ষে আসে। আনুমানিক ৪৫৮ খৃস্টাব্দে তারা ভারত আক্রমণ করলে গুপ্তসম্রাট **স্কন্দগুপ্ত** তাদের পরাজিত করেন। কিন্তু হুণেরা পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজা **ফিরোজকে** পরাজিত ও নিহত করে। এর ফলে তাদের শক্তি বেড়ে যায়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে দেখা যায় বালখ্কে রাজধানী করে হুণেরা বিরাট জায়গা নিয়ে রাজ্য গড়ে তোলে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিমী-তুর্কীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় পারস্যের সাসানীয় বংশের যে রাজা ছিলেন তিনি তুর্কীদের সঙ্গে মিলে হুণদের পরাজিত করেন। হুণরাজা যুদ্ধে মারা যান। পারস্যরাজ অক্ষুনদীর দক্ষিণ তীরের সব হুণ অঞ্চলই অধিকার করে নেন।

স্কন্দগুপ্তের হাতে হুণদের পরাজয়ের পর ভারতে হুণদের সম্বন্ধে

বিশেষ কিছু জানা যায় না। এরপর সুঙ-ইউন নামে চীনা পরিব্রাজকের লেখা থেকে হুণদের কথা জানা যায়। ৫২০ খৃস্টাব্দে তিনি গান্ধারে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, হুণেরা গান্ধার জয় করেছিল এবং কি-পিন অর্থাৎ কাশ্মীরের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিল। এক গ্রীক লেখকের লেখা থেকে জানা যায়, ভারতের উত্তরাঞ্চলে শ্বেত হুণদের বসতি ছিল। এরান (Eran) লিপি থেকে হুণরাজ তোরমানের কথা জানা যায়। ৭৭৮ খৃস্টাব্দে লেখা জৈনগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তোরমানের উত্তরাপথের উপর আধিপত্য ছিল। হিউয়েন সাঙ্ আর এক হুণ রাজা মিহিরকুলের কথা বলেছেন। কল্হনের রাজতরঙ্গিনী বইতেও তোরমান ও মিহিরকুলের কথা আছে। যশোধর্মনের মান্দাসর লিপি থেকেও মিহিরকুল সম্বন্ধে জানা যায়। স্কন্দগুপ্তের হাতে হুণরা হারবার পর তারা ভারত আক্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা আবার ভারত অক্রমণ করে। তোরমান ও মিহিরকুলের অধীনে হুণেরা বার বার ভারত আক্রমণ করে। ৪৮৪ খৃস্টাব্দে তোরমান ভারত আক্রমণ করে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু ও মধ্যভারতের কিছু অংশ জয় করে নেন। তাঁর রাজ্য সম্ভবতঃ প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৫১১ খৃস্টাব্দে তোরমান মারা গেলে তাঁর ছেলে মিহিরকুলের অধীনে হুণেরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শাকালা বাশাকল ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি অ্যাটিলার মত নিষ্ঠুর ছিলেন। পাহাড়ের ওপর থেকে জীবন্ত হাতী ফেলে দিয়ে তিনি মজা দেখতেন। গুপ্তরাজা নরসিংহ বালাদিত্য মিহিরকুলকে বন্দী করেছিলেন। তবে মায়ের অনুরোধে তাঁকে তিনি ছেড়ে দেন। এর পরে মিহিরকুল কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। পরে আবার তিনি অত্যাচার শুরু করেন। মালবের রাজা যশোধর্মন এবার তাঁকে পরাজিত করেন। মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় নেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে কাশ্মীরের রাজাকে মেরে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। ৫৪০ খৃস্টাব্দে তিনি মারা গেলে হুণেরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরা

ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মিশে যায়। হুণেরা শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের টাকায় শিবের বাহন ষাঁড়ের মূর্তি আঁকা আছে। ভারতীয়দের তারা বিয়েও করত। অনেক পণ্ডিত মনে করেন ভারতের রাজপুত জাতিগুলোর সঙ্গে হুণদের রক্তের সম্পর্ক আছে। এই রাজপুত জাতি মুসলমানদের ভারতে রাজ্য স্থাপনে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

হর্ষবর্ধন

(খৃস্টাব্দ ৬০৬ হইতে ৬৪৭)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর অনেকদিন ভারতবর্ষে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। এই সময় উত্তর ভারতে কতকগুলো রাজবংশ দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ, কনৌজের মৌখারী বংশ, মালবের গুপ্তবংশ ও কামরূপের বর্মন বংশ প্রধান। মৌখারী ও পুষ্যভূতি বংশ কিছুদিনের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পুষ্যভূতি বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **প্রভাকরবর্ধন**। তিনি মারা গেলে তাঁর বড় ছেলে রাজ্যবর্ধন রাজা হন। গৌড়ের রাজা **শশাঙ্ক** রাজ্যবর্ধনকে নিহত করলে প্রভাকর বর্ধনের ছোট ছেলে **হর্ষবর্ধন** রাজা হন।

হর্ষবর্ধন

আনুমানিক ৬০৬ খৃস্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হয়েছিলেন। এর আগে শশাঙ্কের আক্রমণে কনৌজের মৌখারী রাজা **গ্রহবর্মাও** নিহত হয়েছিলেন। গ্রহবর্মা ছিলেন শশাঙ্কের বোন **রাজ্যশ্রীর** স্বামী। রাজ্যশ্রী শত্রুদের হাতে বন্দিনী হয়েছিলেন। বন্দীশালা থেকে পালিয়ে রাজ্যশ্রী যখন বিন্ধ্য পর্বতে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে

মরতে যাচ্ছিলেন, হর্ষ তখন বোনকে উদ্ধার করেন। কনৌজে রাজা না থাকায় হর্ষ তারও রাজা হন এবং থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যান।

রাজ্যবিস্তার : হর্ষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। কিন্তু হর্ষ শশাঙ্কের কোন ক্ষতি করতে পারেননি। শশাঙ্ক যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেছিলেন। শশাঙ্ক মারা গেলে হর্ষ পশ্চিম-বিহার ও উড়িষ্যা জয় করেন। হর্ষের রাজ্যসীমা উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্বে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রের বল্লভী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সভাকবি বাণভট্টের মতে তিনি তুষার-শৈল অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্যটিও জয় করেছিলেন। মগধের ওপরও তাঁর প্রভুত্ব ছিল। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মাও তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি সকলোত্তরাপথ-নাথ উপাধি নিয়েছিলেন। তবে মনে হয় সমস্ত উত্তর ভারত হর্ষের অধীন ছিল না। তিনি যথাসম্ভব এক বিশাল রাজ্য গঠন করে **শিলাদিত্য** উপাধি নিয়েছিলেন।

দক্ষিণ ভারত অভিযান : হর্ষের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিযান হল দক্ষিণ ভারত অভিযান। কিন্তু এই অভিযানে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় **পুলকেশীর** কাছে হেরে গিয়েছিলেন। ফলে নর্মদার তীর থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। নর্মদা নদী দুজনের রাজ্যের দক্ষিণ ও উত্তর সীমা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। গুপ্তযুগে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল হর্ষের সময় সেই ঐক্য কেবল মাত্র উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ হর্ষ ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হতে পারেন নি। দক্ষিণ ভারত দ্বিতীয় পুলকেশীর অধীনে আলাদা একটা শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

হর্ষের ধর্ম : বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের লেখা থেকে হর্ষের

সময়ের সব ঘটনা জানা যায়। হর্ষ প্রথমে শৈব ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সবধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। অশোকের মত তিনি জীবহত্যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একবার তিনি কনৌজে এক ধর্মসভা ডাকেন। বৌদ্ধ ছাড়াও ব্রাহ্মণ ও জৈনেরা এই সভাতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় হর্ষ এক'শ ফুট উঁচু এক মন্দির তৈরি করেন এবং সেখানে বুদ্ধের এক সোনার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

হর্ষের বিদ্যানুরাগ: হর্ষ নিজে সুকবি ছিলেন। তিনি প্রিয়দর্শিকা, নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক লেখেন। বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি হর্ষের জীবনী নিয়ে "হর্ষচরিত" লেখেন। এছাড়া বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক কাদম্বরী তাঁর লেখা। হর্ষের সময় নালন্দা ছিল বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।

হর্ষের দানশীলতা: হর্ষ একজন দাতা ছিলেন। প্রতিদিন তিনি অনেক দান করতেন। প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর তিনি প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে একটা দান-মেলা বসাতেন। হর্ষ প্রথম দিনে বুদ্ধের, দ্বিতীয় দিনে সূর্যের এবং তৃতীয় দিনে শিবের পূজো করতেন। প্রত্যেক দিন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের এবং গরীব লোকদের হর্ষ নানা রকমের দান করতেন। শেষদিনে রাজকোষে পাঁচ বছরে যা জমেছে তাও দান করতেন। এমন কি নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ও গহনাও দান করে ভিক্ষুর বেশে রাজধানীতে ফিরতেন।

তৃতীয় পাঠ

হিউয়েন সাঙের বিবরণ

হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ১৬ বছর ভারতে ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম সি-ইউ-কি। এই বই থেকে আমরা সে সময়কার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে পারি।

সমাজ জীবন ঃ হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় ভারতীয়েরা সহজ ও সরল জীবন যাপন করত। তিনি ভারতীয়দের চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। ভারতীয়েরা সৎ, নম্র, অতিথিবৎসল ও ধর্মপ্রাণ ছিল। স্ত্রী লোকদের স্বাধীনতা আগের তুলনায় কমে গিয়েছিল। তারা শাস্ত্রপাঠ করতে পারত না। স্বয়ম্বর প্রথা চালু ছিল। পুরুষেরা বহু বিবাহ করত। শাক-সব্জি, দুধ, ঘি, পিঠা লোকে খাদ্য হিসেবে খেত। পেঁয়াজ, রসুন খেলে লোককে অস্পৃশ্য মনে করা হত।

হিউয়েনসাঙ

ধর্ম ঃ হর্ষের সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মই ছিল। আগের মত বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন ছিল না। তবে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি একেবারে লোপ পায় নি। ভারতে তখন প্রায় ৭০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল। উত্তর বিহার এবং উত্তরবাংলার কিছু জায়গায় জৈনধর্মের প্রাধান্য ছিল। হর্ষ প্রথমে শৈব ছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ৬৪৩ খৃস্টাব্দে কনৌজে হর্ষ এক ধর্ম সম্মেলন ডাকেন। সব ধর্মের লোকেই সেখানে জমায়েত হন। হিউয়েন সাঙও এই ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন। ধর্মে সহিষ্ণুতাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

আর্থিক অবস্থা ঃ হিউয়েন সাঙের মতে দেশে খনিজ সম্পদ ও খাদ্যশস্য প্রচুর ছিল। এই সময় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। কনৌজ ছিল সে সময়কার সমৃদ্ধ নগর। মালব, গুজরাট প্রভৃতি দেশগুলো হতে সমুদ্রপথে পশ্চিমদেশের সঙ্গে ভারতবাসী বাণিজ্য করত। বাংলাদেশে তাম্রলিপ্ত ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর। সোনা

রূপোর টাকা, কড়ি ও ছোট ছোট মুক্তো বেচা কেনার লেনদেন হিসাবে ব্যবহার হত।

হিউয়েন সাঙ হর্ষের শাসনের খুব প্রশংসা করেছেন। অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। দেশে দস্যুর ভয় ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজে দস্যুদের হাতে পড়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ ৬৪১ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন। সেই সময় চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী রাজত্ব করতেন। তিনি চালুক্যরাজা ও রাজ্যের প্রশংসা করেছেন। পল্লভ রাজ্য ছিল চালুক্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নরসিংহবর্মা ছিলেন পল্লভরাজা। এই সময় দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চী ছিল শ্রেষ্ঠ নগর। হিউয়েন সাঙ এঁদের কথাও লিখে গেছেন। এই ভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ৬৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি নিজের দেশে ফিরে যান।

চতুর্থ পাঠ | নালন্দা

নালন্দা ছিল এই যুগে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। নালন্দা বিহারের বর্তমান রাজগীরের সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁওতে অবস্থিত ছিল। প্রথম খৃস্টাব্দ থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা হলেও খৃষ্টীয় ৪২৫ থেকে ৬২৫ এর মধ্যেই নালন্দার গৌরবময় যুগ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছটি মহাবিদ্যালয় ছিল। ছ'জন রাজা এই ছটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমটি রাজা শক্রাদিত্য, দ্বিতীয়টি বুদ্ধগুপ্ত, তৃতীয়টি তথাগতগুপ্ত, চতুর্থটি বালাদিত্য, পঞ্চমটি বজ্র এবং ষষ্ঠটি কেউ বলেন হর্ষ আবার কেউ বলেন গৌড়ের কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সব রাজাদের দেওয়া গ্রাম থেকে নালন্দার খরচ চলত।

মঠে বড় বড় বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতেরা পড়াতেন। দেশবিদেশ

থেকে অনেক ছাত্র নালন্দায় পড়াশুনোর জন্যে আসত। হিউয়েন সাঙের সময় এর ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার ও অধ্যাপক ছিলেন দেড় হাজার। ভর্তির সময় দ্বার পণ্ডিতদের কাছে ছাত্রদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। পরীক্ষায় পাশ করলেই তবে ছাত্রেরা ভর্তি হতে পারত। ছাত্রদের থাকা খাওয়ার খরচ লাগত না। শাস্ত্র-আলোচনা, অধ্যাপকদের ভর্তি করা, ধর্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতাই ছিল নালন্দার আদর্শ। ছাত্রদের অনেক বিষয় পড়তে হত। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা বলে পাঁচটা বিষয় পড়ানো হত। বৌদ্ধশাস্ত্র, দর্শন, রসায়ন, সাহিত্য

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

আয়ুর্বেদ প্রভৃতিও পড়তে হত। প্রশ্নোত্তর, তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজেও নালন্দায় পড়াশুনো করেছেন।

নালন্দায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ধর্মপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, চন্দ্রপাল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মঠের প্রধান আচার্য ছিলেন বাঙালী শীলভদ্র। এখানকার শ্রেষ্ঠ উপাধি ছিল কুলপতি ও দ্বিতীয় উপাধি পণ্ডিত। তুজন শ্রেষ্ঠ আচার্য ছাড়া কেউ এই উপাধি পেতেন না। মঠের

শাসন ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক। শোনা যায় মঠটা আগে ছয়তলা ছিল। মঠের ভেতরে পড়াশুনোর জন্যে আলাদা ঘর, লাইব্রেরী, ছাত্রও অধ্যাপকদের থাকার আলাদা আলাদা ঘর ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা এক আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকে এর গৌরব কমতে থাকে। তবে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নালন্দার অস্তিত্ব ছিল।

(খ) হর্ষ পরবর্তী যুগ [৮ম হইতে ১২ শতাব্দী]

প্রথম পাঠ | রাজপুত জাতি

হর্ষবর্ধনের পরে উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই সব রাজ্যের অধিকাংশ রাজারাই নিজেদের রাজপুত বলে দাবী করত। মোটামুটি ভাবে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাজপুতেরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেই-জন্যে এই যুগকে **রাজপুত** যুগ বলা যেতে পারে। এই রাজপুতদের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। রাজপুতেরা নিজেদের চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় বলে দাবী করে। আবার কেউ কেউ বলেন, এরা বিদেশী জাতীর মিশ্রণে এক শংকর জাতি। হুণ, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি ও ভারতীয়দের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় এই রাজপুত জাতি। তবে সব রাজপুতগোষ্ঠী এই বিদেশীদের থেকে উৎপত্তি হয়নি। এদের কয়েকটা বংশ ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে এসেছে। যাই হোক এই রাজপুত জাতি ভারতের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত বংশগুলোর মধ্যে গুর্জর প্রতিহার, চান্দেল্ল, চৌহান, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি বংশগুলো প্রধান।

গুর্জর প্রতিহারেরাই প্রথমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ

শতাব্দীতে হরিচন্দ্র গুর্জর যোধপুরে একটা রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের আর একটা শাখা মালবে একটা রাজ্য গড়ে তোলে। প্রথম নাগভট্ট, বৎসরাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, ভোজ, মহেন্দ্রপাল প্রভৃতি এই বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এঁদের রাজত্বকালে গুর্জর-প্রতিহার বংশ উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। ১০১৮ খৃস্টাব্দে সুলতান মামুদ কনৌজ ধ্বংস করলে এই বংশের পতন হয়।

গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি নামে রাজপুত রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই বংশের রাজাদের মধ্যে প্রথম ভীম, জয়সিংহ, কুমারপাল, দ্বিতীয় ভীম প্রভৃতি বড় রাজা ছিলেন। দ্বিতীয়-ভীম মহম্মদ ঘুরী গুজরাট আক্রমণ করলে মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন। এই বংশ প্রায় তিনশ বছর রাজত্ব করেছিল। এই বংশের আর এক শাখা বাখেলা বংশ শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। বাখেলা রাজা কর্ণদেবের সময় আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করেন।

বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল বংশ দশম শতাব্দীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চান্দেল্ল বংশের প্রধান কেন্দ্র খজুরাহোতে এই সময় অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছিল। এই বংশের রাজারা অনেকদিন ধরে মুসলমানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ১২০২ খৃস্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবাক কালিঞ্জর অধিকার করলে চান্দেল্ল বংশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

নবম শতাব্দীর শেষ দিকে জব্বলপুরে কলচুরিরা একটা রাজ্য গড়ে তোলে। এই বংশের রাজা লক্ষ্মীকর্ণ কলিঙ্গ ও কাঞ্চার রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। বাংলার পালরাজা নয়পাল ও বিগ্রহপালের বিরুদ্ধে অভিযান করে তিনি বীরভূম পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করেছিল।

পারমার গোষ্ঠী রাষ্ট্রকূট রাজাদের সামন্ত ছিল। রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতিহার বংশের পরে পারমারেরা মালবে একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের রাজা ভোজ ছিলেন শক্তিশালী রাজা। তিনি চালুক্য ও কলচুরিদের যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী ধারা

সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। চালুক্য, সোলাঙ্কি ও কলচুরিদের মিলিত আক্রমণে ধারা ধ্বংস হয় ও ভোজ নিহত হন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কনৌজ ও বারাণসীকে নিয়ে গাহড়বাল বংশের উত্থান হয়। এই বংশের রাজাদের মধ্যে গোবিন্দ ও জয়চন্দ্র ছিলেন প্রধান। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে জয়চন্দ্রের ঝগড়া হলে জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘুরীকে ডেকে আনেন। ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১১৯২ খৃস্টাব্দে পৃথ্বীরাজকে নিহত করে, জয়চন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করেন। জয়চন্দ্র আত্মহত্যা করেন। পৃথ্বীরাজ ছিলেন চৌহান বংশের রাজা। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করেছিল। ১১৯২ খৃস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হলে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ | ত্রি-শক্তি সংগ্রাম

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কনৌজকে নিয়ে মালবের গুর্জর প্রতিহার বংশ, দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট ও বাংলাদেশের পাল রাজাদের মধ্যে এক ত্রি-শক্তি যুদ্ধ হয়। প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজ কনৌজ জয় করতে ইচ্ছে করেছিলেন। অন্যদিকে পাল-রাজা ধর্মপালও কনৌজ জয় করে উত্তর ভারতে আধিপত্য বাড়াতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজাও চেয়েছিলেন কনৌজ জয় করে "মহদয়োশ্রী" লাভ করতে। বৎসরাজের সঙ্গে ধর্মপালের যে যুদ্ধ হয় তাতে ধর্মপাল হেরে যান। কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুবের কাছে হেরে গিয়ে বৎসরাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে পালিয়ে যান। ধ্রুব হঠাৎ তাঁর রাজ্যে ফিরে যান। এই সুযোগে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করে নিজের প্রিয়পাত্র চক্রায়ূধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার রাজা হয়ে কনৌজ জয় করে চক্রায়ূধকে তাড়িয়ে দেন।

ধর্মপালও নাগভট্টের কাছে হেরে যান। ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য চান। গোবিন্দ, নাগভট্টকে পরাজিত করলে উত্তর ভারতে ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গড়ে উঠতে পারে না। ধর্মপালও গোবিন্দের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। নাগভট্টের পরেও কয়েকজন শক্তিশালী প্রতিহার রাজা ছিলেন। কিন্তু কনৌজকে নিয়ে এই ধরনের যুদ্ধ আর হয়নি।

(গ) বাংলাদেশ

প্রথম পাঠ | শশাঙ্কের রাজত্বকাল

৬০৬ খৃস্টাব্দের কিছু আগে সম্ভবতঃ ৬০৩ খৃস্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হন। তাঁর সময় থেকেই গৌড় অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতের ইতিহাসে এক বড় শক্তি হিসেবে পরিচিত হয়। শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কিভাবে রাজা হন তাও ঠিক জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে শশাঙ্ক শেষ গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন। মহাসেন গুপ্ত মারা গেলে শশাঙ্ক গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির কাছে কর্ণসুবর্ণতে।

শশাঙ্ক পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ), দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুরের দাঁতন অঞ্চল), উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা ও দক্ষিণ কোশল জয় করেন। শশাঙ্ক যতদিন বেঁচে ছিলেন স্বাধীনভাবে পশ্চিমে বারাণসী থেকে দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন।

শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, শশাঙ্ক কুশীনগরের এক বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের বের করে দেন। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম গাছটা কেটে ফেলেন ও বৌদ্ধধর্মের অনেক ক্ষতি করেন।

কিন্তু এসব কথা ঠিক নয়। কারণ হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের রাজধানীতে দশটা বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। এইভাবে কিছুকাল রাজত্ব করার পর সম্ভবতঃ ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় শশাঙ্ক মারা যান।

দ্বিতীয় পাঠ | পাল-সেনযুগে বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি

পাল-সেন যুগ বাংলা দেশের ইতিহাসের স্বুবর্ণ যুগ বলা যায়। নানাভাবে এই সময় উন্নতি হয়।

পালযুগে সমাজ-জীবন ঃ বাঙালীরা সৎ, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল। স্ত্রীজাতি সমাজে বিশেষ সম্মান পেত। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু তারা পুরুষের অধীন ছিল। বিধবাদের জন্যে সমাজে কঠোর নিয়ম ছিল। সহমরণ প্রথা থাকলেও তা খুব বেশী চালু ছিল না। বাঙালীরা জমকালো পোষাক পরত। তবে সাধারণ মানুষ ধুতি ও স্ত্রীলোকেরা শাড়ী পরত। সধবা স্ত্রীলোকেরা কপালে সিঁদুর ও টিপ এবং পায়ে আল্‌তা দিত। বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত। ভাত, মাংস, দুধ, ফলমূল ছিল বাঙালীর খাদ্য। মাছ ছিল সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। যানবাহন হিসাবে গরু ও ঘোড়ার গাড়ী, পাল্কী, হাতী, নৌকা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

ধর্ম ঃ পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মকেও তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন। পূর্ব-বাংলায় দুর্গা পূজা হত। হোলী, লক্ষ্মীপূজা ও ভাইফোঁটা বাংলার জনপ্রিয় ছিল। এই সময় মহাযান বৌদ্ধমতের প্রসার হয়েছিল।

অর্থনীতি ঃ কৃষি ছিল পালযুগের ভিত্তি। গ্রামবাসীরা নিজেদের জিনিষ নিজেরা বানাত। বাণিজ্যের প্রসারও হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত ছিল বিখ্যাত বন্দর। এখান থেকে

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বাণিজ্য জাহাজ যেত। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম ছিল আর এক বাণিজ্যকেন্দ্র। বাংলার কার্পাসের কাপড় দূর দেশে চালান হত। লাক্ষাশিল্প এবং কাঠ ও হাতীর দাঁতের ওপর কারুকার্য ছিল বিখ্যাত। স্থলপথে আসাম, তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও বর্মার সঙ্গে বাণিজ্য চলত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : পালযুগে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন। লুইপাদ, কাহ্নপাদ গুরুদেবেরা চর্যাপাদ রচনা করেছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন পরে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল প্রভৃতি গানগুলো চর্যাপদ থেকে এসেছে। বড়ু চণ্ডীদাস এই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে অবলম্বন করে বাংলায় কাব্য লেখেন। যোগী সাধুরাও এই সময় গীত রচনা করেছেন। যোগীসাধুদের নিয়েও ময়নামতীর গান লেখা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্য : সংস্কৃতের চর্চা পালযুগে খুবই হত। এই বিষয়ে প্রথমেই ব্যাকরণ-বিদ্ চন্দ্র-গোমিনের নাম করতে হয়। দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপানি, দার্শনিক শ্রীধর ভট্ট ও পদ্মনাভ সংস্কৃত-সাহিত্য রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। কল্যাণবর্মার লেখা জ্যোতিষগ্রন্থ সারবলী, চক্রপাণি দত্তের লেখা চরক ও শুশ্রুতের ওপর টীকা প্রভৃতি বিখ্যাত বই ছিল। এছাড়া রামপালের মন্ত্রী সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্য উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা : পালযুগে শিক্ষা বিস্তার হত বিহার ও আশ্রমের মধ্য দিয়ে। নালন্দার খ্যাতি এই সময় যথেষ্ট ছিল। নালন্দার অনুকরণে পালরাজারা ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী বিহার তৈরি করান।

ওদন্তপুর বিহার : গোপাল (অনেকের মতে ধর্মপাল) বর্তমান পাটনা জেলায় ওদন্তপুরীতে এই বিহার তৈরি করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। এই

বিহারে একটা বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। অতীশ দীপঙ্কর এখানেই শিক্ষা লাভ করে "শ্রীজ্ঞান" উপাধি পান।

বিক্রমশীলা বিহার ঃ ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহার বর্তমান ভাগলপুরের কাছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকে বলেন এটি নালন্দার খুব কাছে ছিল। ধর্মপালের আর এক নাম ছিল বিক্রমশীলা। তার নাম অনুসারে এর নাম হয় বিক্রমশীলা। নালন্দার পরেই বিক্রমশীলার খ্যাতি ও গৌরব ভারত ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্রমশীলায় মোট ১০৭টা মঠ ও ৬টা মহাবিদ্যালয়
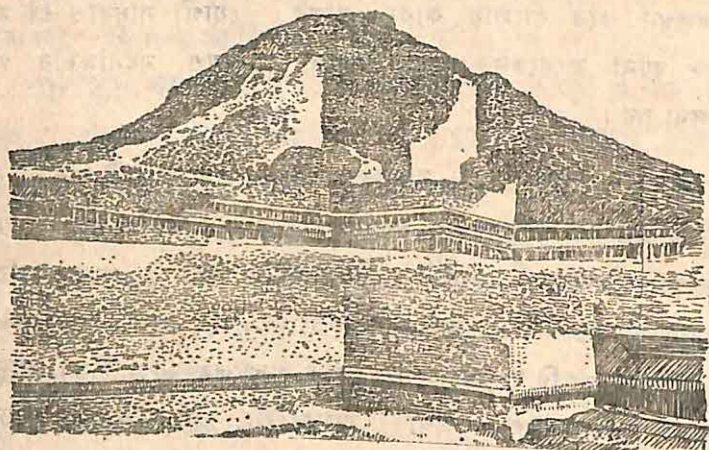
পাহাড়পুরের মন্দির

ছিল। ১১৪ জন অধ্যাপক এখানে শিক্ষা দিতেন। তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যে এখানে একটা আলাদা বিভাগ ছিল। শিক্ষাকাল শেষ হলে পাল রাজারা উপস্থিত থেকে সকল বিদ্যার্থীকে উপাধি দিতেন। এই সময় চন্দ্রগোমিন্, আচার্য ধর্মপাল জেতারি, অভয়কর গুপ্ত, অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। দীপঙ্করই ছিলেন এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শিল্প ঃ—পালযুগে শিল্পের খুবই উন্নতি হয়। ধীমান ও

বীটপাল ছিলেন দুজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ইটের তৈরি মন্দির অনেক দেখা যায়। বাঁকুড়া, বর্ধমান, দিনাজপুর, রামগড়ের মন্দির খুবই বিখ্যাত। এইযুগে ধাতু শিল্পেরও খুব উন্নতি হয়। মহাস্থানগড়ের একটা ধাতুর মূর্তি ও পাহাড়পুর ও ময়নামতী প্রভৃতি জায়গা থেকে পোড়ামাটির শিল্পের অনেক নমুনা পাওয়া গেছে।

পালযুগের ভাস্কর্য

সেনযুগে সমাজ জীবন ঃ সেনযুগে ব্রাহ্মণেরা প্রভাবশালী ছিল। সমাজে নীচু জাতের লোকদের অনেক বাধা মেনে চলতে হত। বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সময় সমাজে অনেক সংকর বর্ণের সৃষ্টি হয়। বল্লালচরিত বই থেকে জানা যায় রাজা ইচ্ছে করলে কোন শ্রেণীকে উচুতে ওঠাতে বা নীচে নামাতে পারতেন। এতদিন পর্যন্ত বর্ণভেদ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু বল্লালসেন কুলভেদ প্রথা চালু করেন। একে কৌলিন্য প্রথা বলে।

ধর্ম ঃ—সেন রাজারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁরা শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের সময় হিন্দুধর্মের প্রসার হয়। কিন্তু সেনরাজারা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। বল্লালসেন আরাকান, নেপাল, ভুটান, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি জায়গায় ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এই সময় ধর্মের মধ্যে কোন রেষারেষি ছিল না।

সাহিত্য ঃ—পালযুগের মত সেনযুগেও অনেক সাহিত্যিক ছিলেন। বল্লালসেন ও লক্ষণসেন দুজনেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। বল্লাল সেন "দানসাগর" "অদ্ভুত সাগর" "ব্রতসাগর" "আচার্যসাগর" ও "প্রতিষ্ঠাসাগর" নামে পাঁচটি বই লেখেন। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ, "হারলতা" ও "পিতৃদায়িতা" নামে দুটো বই লেখেন। লক্ষণসেনের সভায় উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন ও জয়দেব নামে পঞ্চকবি ছিলেন। ধোয়ী পবনদূত লিখেছিলেন। জয়দেব ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি "গীতগোবিন্দম্" নামে একটি গীতিকাব্য লেখেন। তাঁকে বাংলার আদিকবি বলা হয়। এই যুগকে বাংলা ভাষা ও লিপির সৃষ্টিকাল বলা যেতে পারে।

(ঘ) দক্ষিণ ভারত

প্রথম পাঠ | বাতাপীর চালুক্য

গুপ্তযুগের পরে দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলো শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে চালুক্য একটা। এদের আদি বাসভূমি নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। যাই হোক পরে চালুক্যরা দুটো শাখায় ভাগ হয়ে দক্ষিণ ভারতে দুটো আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে। একটা হায়দ্রাবাদের কল্যাণীতে; অন্যটা মহারাষ্ট্রের বিজাপুর জেলার বাতাপি বা বাদামিতে। বাতাপী বা বাদামির নাম থেকে এদের বাতাপীর চালুক্য বলা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **প্রথম পুলকেশী**। তিনি কয়েকটা রাজ্য জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **দ্বিতীয় পুলকেশী**। ইনি বনবাসীর কদম্ব, মহীশূরের গঙ্গ, মালবের অলুপ রাজাদের হারিয়ে দক্ষিণ ভারতে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি গুজরাট, মালব এবং গুর্জর রাজাদেরও পরাজিত

করেছিলেন। হর্ষ দক্ষিণ ভারত জয় করতে গেলে পুলকেশীর কাছে হেরে যান। নর্মদার তীর তাঁদের রাজ্যের সীমা হয়। পুলকেশী কলিঙ্গ ও কোশলের রাজাদেরও হারিয়েছিলেন। তিনি পিঠাপুরম্ কুনাল ও এলোর জয় করেছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজা মহেন্দ্রবর্মনকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের কাছে যুদ্ধে হেরে যান ও নিহত হন।

পুলকেশী প্রাচীন ভারতের রাজাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। ৬৪১ খৃস্টাব্দে তাঁর রাজ্যে হিউয়েন সাঙ গিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ পুলকেশীর জ্ঞান, বুদ্ধি ও মহৎ মনের কথা বলেছেন। তাঁর সৈন্যেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। তারা কোন শত্রুকে ভয় করত না। পুলকেশীর রাজ্যের ব্যাস ছিল ৮৩৬ মাইল ও রাজধানী ছিল ধনসম্পদে ভরা।

পুলকেশীর পর প্রথম বিক্রমাদিত্য, বিনয়াদিত্য, বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী ছাড়াও চোল পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি রাজ্য জয় করেছিলেন। তাঁর পরে পল্লব ও রাষ্ট্রকূটেরা বারবার চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করলে চালুক্যরা দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রকূটরাজা প্রথম কৃষ্ণ ৭৫৭ খৃস্টাব্দে চালুক্যদের পতন ঘটান।

দ্বিতীয় পাঠ | কাঞ্চীর পল্লব বংশ

পল্লব বংশের প্রাচীন ইতিহাস সঠিক জানা যায় নি। সম্ভবতঃ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে তৃতীয় শতাব্দীর শেষদিকে এই রাজবংশের উত্থান হয়েছিল। কাঞ্চীনগর ছিল এদের রাজধানী। চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বিষ্ণুগোপ নামে পল্লব রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এরপর ২২৫ বছর ধরে পল্লবদের আর

কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু, চোল, চের, পাণ্ড্য ও সিংহল জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য কৃষ্ণা থেকে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। সিংহবিষ্ণুর ছেলে মহেন্দ্রবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন।

মহেন্দ্রবর্মনের ছেলে প্রথম নরসিংহবর্মন ৬৪২ থেকে ৬৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি সিংহলের বিরুদ্ধে দুটি নৌ অভিযান পাঠিয়েছিলেন। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তিনি চোল, পাণ্ড্য ও চের রাজাদেরও যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। নরসিংহবর্মন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজধানী কাঞ্চীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম নরসিংহবর্মনের পর প্রথম পরমেশ্বর, দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন, দ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রভৃতি কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ উপাধি নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনের সময় চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী জয় করেছিলেন। পরমেশ্বরবর্মনের পর থেকে পল্লবদের পতন আরম্ভ হয়। অবশেষে ৮৮০ খৃস্টাব্দে চোল, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের বারবার আক্রমণে পল্লব রাজ্যের পতন হয়।

তৃতীয় পাঠ — চালুক্য ও পল্লব যুগে শিল্প ও স্থাপত্য

চালুক্য শিল্প ও স্থাপত্য ঃ চালুক্য ও পল্লব বংশের রাজারা শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের সময় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ধারোয়ার, বিজাপুর জেলার আইহোল, বাদামী ও পট্টডকল এবং ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরগুলো চালুক্য শিল্প-

স্থাপত্যের জন্যে বিখ্যাত। আইহোলে প্রায় সবশুদ্ধ ৭০টি মন্দির পাওয়া গেছে। এই জন্যে একে মন্দিরনগরী বলা হয়। চালুক্য-রাজ প্রথম কীর্তিবর্মনের সময় বাদামীর গুহা-মন্দিরগুলো তৈরি হয়েছিল। আইহোলের সঙ্গমেশ্বর মন্দির ভাস্কর্যের জন্যে বিখ্যাত। অজন্তার কতকগুলো বিহার ও চৈত্য ও ইলোরার চৈত্যগুলো এযুগের বৌদ্ধ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাদামী গুহার ছবিগুলো চালুক্য রাজাদের সময় আঁকা। এগুলো হল শিবের তাণ্ডবনাচ, হর-পার্বতীর বিয়ে, বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী প্রভৃতি।

পল্লব শিল্প ও সাহিত্য ঃ স্থাপত্যশিল্পে পল্লবদের দান অসীম। রাজা মহেন্দ্রবর্মনের আগে মাটি অথবা কাঠ স্থাপত্য শিল্পে ব্যবহার করা হত। সম্ভবত অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গুহামন্দির তৈরি করার ধারা পল্লবেরাই দক্ষিণ-ভারতে প্রচলন করে, তিরুচিরাপল্লী, বেজওয়াদা, ভৈরব কোনণ্ডা প্রভৃতি জায়গায় ১৪টি গুহা মন্দির পাওয়া গেছে। মহেন্দ্রবর্মনের সময় থেকেই পাথর কেটে মন্দির তৈরি আরম্ভ হয়।
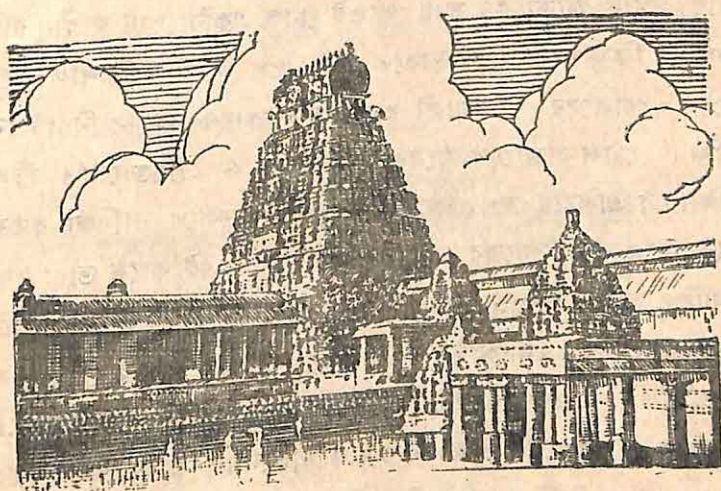
কাঞ্চীভরমের মন্দির

নরসিংহবর্মন, মামল্লপুরম বা মহাবলী পুরমে একটা নগর তৈরি করেন। এখানে তিনি কতকগুলো রথ মন্দির তৈরি করান। পাহাড়

কেটে এগুলো করা হয়েছিল। দ্রৌপদীর রথ, ভীমের রথ, অর্জুনের রথ প্রভৃতি এযুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য। এগুলো ছাড়াও মুক্তেশ্বরের মন্দির, ঐরাবতেশ্বর মন্দির, কাঞ্চীর কৈলাশ নাথ মন্দিরও প্রসিদ্ধ। গঙ্গাবতরণ, গিরিগোবর্ধন ধারণ, অর্জুন তপস্যা, এবং রথ মন্দিরের গায়ে অনেক নরনারীর ছবি আঁকা আছে। কাঞ্চীভরমে প্রায় এযুগের ১০০টি মন্দির আছে। পল্লব শিল্পের প্রভাব পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর পড়েছিল। পাদুকোটা স্টেটের সীত্তানা বা শীল মন্দিরের গায়ে ও তিনাভেলী জেলার তিরুমালাইপুরমের গুহার গায়ের ছবিগুলো এযুগের চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চতুর্থ পাঠ | চোলদের সামুদ্রিক প্রসার

চোল বংশ দক্ষিণ ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকেই চোল একটা ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু পরে দক্ষিণ ভারতে এই বংশ খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চোলদের শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণ তাদের বিরাট নৌ-শক্তি। চোল রাজাদের অনেক যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যপোত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে তারা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করত। সেই সঙ্গে তারা সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব করত। এই কাজে তারা সফল হয়েছিল তাদের বিরাট নৌ-শক্তির জন্যে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চোল রাজা নৌ-অভিযান চালিয়ে সমুদ্রের অনেক দ্বীপ জয় করেছিলেন। প্রথম রাজ চোল নৌ-অভিযান পাঠিয়ে আরব সাগরের মালদ্বীপ ও সিংহলের উত্তরাংশ জয় করেছিলেন। ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপও তিনি জয় করেছিলেন।

তাঁর ছেলে রাজেন্দ্র চোলের সময় চোলদের নৌ-শক্তি আরও বেড়ে যায়। তাঁর নৌ-বাহিনী জাভা, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি জয় করে সেখানকার শৈলেন্দ্র রাজাদের চোল অধীনতা স্বীকারে বাধ্য

করেছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর প্রভুত্ব লাভ করার জন্যেই তিনি শৈলেন্দ্র রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য রাজেন্দ্র চোলের পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অংশ চোলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। রাজেন্দ্রচোল ব্রহ্মদেশ, পেগু, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপও জয় করেছিলেন। এর আগে আর কোন ভারতীয় রাজা বা রাজবংশ সমুদ্রে এতদূর পর্যন্ত নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেন নি।

অনুশীলনী

(ক) গুপ্ত পরবর্তী যুগ

১। হূণ কাদের বলা হয়? তারা কখন ভারত আক্রমণ করে? ভারতে দুজন হূণরাজার বিষয় যাহা জান বল।

২। হর্ষ কিভাবে রাজা হন? হর্ষের রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা দাও।

৩। হর্ষের ধর্ম ও দানশীলতার বিষয় বল।

৪। হিউয়েন সাঙ কে ছিলেন? তাঁর বর্ণনা থেকে সে সময়কার ভারতের সমাজ জীবন সম্বন্ধে বল।

৫। নালন্দার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কী জান?

(খ) হর্ষ পরবর্তী যুগ

১। রাজপুত কাদের বলা হয়? কয়েকটি রাজপুত গোষ্ঠীর নাম কর। তাদের মধ্যে যে কোন দুইটির বিষয় বর্ণনা কর।

২। ত্রি-শক্তি-সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সংগ্রাম কেন হয়? এর বিষয় বল।

৩। **পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নামগুলো একত্রিত কর** :—

(ক) প্রথম নাগভট্ট	(১) দ্বিতীয় নাগভট্ট।
(খ) প্রথম ভীম	(২) চক্রায়ুধ।
(গ) বাঘেলা রাজা	(৩) গুর্জর প্রতিহার।
(ঘ) কনৌজ	(৪) মহম্মদ ঘুরী।
(ঙ) ধর্মপাল	(৫) কর্ণদেব।

(গ) বাংলাদেশ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল — জেলার রাঙ্গামাটির কাছে —। (খ) দণ্ডভুক্তি বলতে মেদিনীপুরের — অঞ্চলকে বোঝায়। (গ) — ছিল বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। (ঘ) — ছিল হুগলী জেলার এক বাণিজ্য কেন্দ্র। (ঙ) পালযুগে — বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন।

২। শশাঙ্কের রাজ্য-বিস্তার ও ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৩। পালযুগের সমাজ-জীবনের বর্ণনা কর।

৪। পালযুগের বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় বর্ণনা কর।

৫। সেনযুগের সমাজ ও সাহিত্যের বিষয় কী জান ?

(ঘ) দক্ষিণ ভারত

১। নীচে কতকগুলো প্রশ্ন ও তার উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি √ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর :—

প্রশ্ন :—(ক) দ্বিতীয় পুলকেশী কোন পল্লব রাজাকে পরাজিত করেন ? (খ) গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কোন পল্লব রাজাকে পরাজিত করেছিলেন ? (গ) মন্দির নগরী কাকে বলা হয় ? (ঘ) মামল্লপুরম্ কি কারণে বিখ্যাত ? (ঙ) কোন চোল রাজা ব্রহ্মদেশ জয় করেছিলেন ?

উত্তর :—(ক) নরসিংহ বর্মন, মহেন্দ্র বর্মন, সিংহবিষ্ণু, বিষ্ণুগোপ (খ) সিংহবিষ্ণু, নরসিংহ বর্মন, মহেন্দ্র বর্মন, বিষ্ণুগোপ। (গ) ইলোরা, ধারোয়ার, আইহোল, পট্টডকল। (ঘ) কৈলাসনাথের মন্দিরের জন্য, রথ মন্দিরের জন্য। চৈত্য গুহার জন্য। (ঙ) রাজেন্দ্র চোল, রাজ রাজ চোল।

২। চালুক্যদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। কয়েকজন পল্লব রাজার নাম কর ও তাঁদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। চালুক্য শিল্প ও স্থাপত্যের বিষয় বর্ণনা কর।

৫। পল্লব শিল্প ও স্থাপত্যের বর্ণনা দাও।

৬। চোলদের সামুদ্রিক শক্তির পরিচয় দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়
প্রথম পাঠ

বহির্বিশ্বে ভারত

সূচনা :—ভারতের উত্তরে হিমালয়। অন্য তিন দিকে সমুদ্র। এই পাহাড় ও সমুদ্র পেরিয়ে অন্য দেশে সে যুগে যাতায়াত করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু কোন বাধাই সে যুগের ভারত-বাসীকে ঘরে ধরে রাখতে পারেনি। ভারতবাসী প্রাচীনকাল থেকেই দূরদূর দেশে জলপথ ও স্থলপথ দুপথেই যাতায়াত করত। চীন, তিব্বত ও মধ্যএশিয়ায় স্থলপথে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জলপথেই ভারতের যোগাযোগ হয়েছিল।

মধ্য এশিয়া :—এখন আমরা যে জায়গাটাকে তুর্কিস্থান বলি তারই অন্যনাম মধ্যএশিয়া। এই অঞ্চল মরুময়। মরুভূমির উত্তর পূর্বসীমায় খোটান, কুচা, কাশগড়, তুরফান, ইয়ারখন্দ, নিরা প্রভৃতি অঞ্চল আছে। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে যাযাবর লোকেরা বাস করত। ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্যের জন্যই এই সব অঞ্চলে যেতেন। পরে ধর্ম প্রচারকেরা সেইসব জায়গায় যান। সেখানে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে গোবি মরুভূমির বালি এই জায়গাগুলো ঢেকে ফেলে। সেইজন্য আমরা এখানকার কথা অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারিনি। বিখ্যাত রুশীয় পণ্ডিত স্যার অরেলস্টাইন এখানকার বালিরস্তূপ খুঁড়ে বহু বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বুদ্ধমূর্তি, হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি, বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ প্রাচীন পটচিত্র পেয়েছেন। এছাড়া পাওয়া গেছে ভারতীয় ভাষা ও অক্ষরে লেখা অনেক পুঁথির পাণ্ডুলিপি।

ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এইসব জায়গায় বেড়াবার সময় যে সব চিহ্ন দেখেছিলেন সেগুলো সত্যি বলে প্রমাণিত হয়।

বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ

দ্বিতীয় পাঠ | চীন ও তিব্বত

চীন ঃ—মধ্যএশিয়া থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীনে এবং তারপর সেখান থেকে কোরিয়া ও জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" চীনপট্টের কথা পাওয়া যায়। চীনপট্ট কথার মানে চীনা-বস্ত্র। পরে চীনা সম্রাট মিংতির চেষ্টায় ও বৌদ্ধধর্মাচার্য, ধর্মরত্ন ও কশ্যপমাতঙ্গের নেতৃত্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। চীনদেশ থেকেও অনেক চীনা পণ্ডিত ভারতে আসেন। তাঁদের মধ্যে সুঙ যুঙ্, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ই-সিং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব পণ্ডিতেরা দেশে ফেরার সময় ভারতীয় পুঁথি নিয়ে যেতেন এবং চীনা ভাষায় সেগুলো অনুবাদ করতেন। কুমার ঘোষ, জ্ঞান ভদ্র, যশো গুপ্ত, গুণ ভদ্র, গুণবর্মা, কুমারজীব প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতেরা চীনে গিয়েছিলেন। তাং যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব ও সভ্যতার মূল আরও শক্ত হয়। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি, গণিতশাস্ত্র, সঙ্গীতকলা চীনে বিশেষ সমাদর লাভ করে। চীনে শিল্প, মূর্তিগঠন প্রভৃতির উপর ভারতীয় শিল্পের প্রভাব পড়ে। চীনে অনেক বৌদ্ধগুহা আছে। তারমধ্যে তুন-হুয়াঙ পাহাড়ের সহস্র বুদ্ধগুহা প্রসিদ্ধ। এইভাবে বহু শতাব্দী ধরে চীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলেছিল।

তিব্বত ঃ ভারত থেকে তুর্কিস্থান দিয়ে চীনে যাবার পথে পড়ে তিব্বত। এই তিব্বত লামাদের দেশ। কোন এক ভারতীয় রাজ-কুমার তিব্বতের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে লেখা আছে। ভারতে যখন হর্ষের রাজত্বকাল তখন তিব্বতে স্রং-সান-গাম্পো ছিলেন তিব্বতের রাজা। অনেক আগেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এসে পেঁছেছিল। স্রং-সান-গাম্পো নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের তিব্বতী ভাষা ও বর্ণমালার ও সংস্কৃত ভাষার প্রসার হয়। তাঁর সময়ে তিব্বতে অনেক মঠ

ও মন্দির তৈরি হয়েছিল। তিব্বতীরা অনেক ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। সেইসব আসল ভারতীয় গ্রন্থ অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। তিব্বতীদের অনুবাদের মধ্যে আমরা সেইসব বই আজও পেয়ে থাকি। চীন দেশের মত তিব্বত থেকেও অনেক বৌদ্ধভিক্ষু, তিব্বত থেকে ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারে থেকে পড়াশুনো করতেন। ভারত থেকেও অনেক পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে **শান্তি রক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমল শাল, অতীশ দীপঙ্কর** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অতীশ দীপঙ্কর

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নানা দোষ দেখা যায়। সেইজন্যে তিব্বতের একজন রাজা বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করতে অতীশকে ডেকে পাঠান। অতীশ বুড়ো বয়সে তিব্বতে যান। তিব্বতে ঘুরে ঘুরে তিনি মহাযান বৌদ্ধমত প্রচার করেন। এইভাবে ১০ বছর তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কার করেছিলেন। অবশেষে ৭৩ বছর বয়সে ১০৫৩ খৃস্টাব্দে তিনি তিব্বতেই মারা যান।

তৃতীয় পাঠ | সুবর্ণভূমি

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলগুলোর মিলিত নাম ছিল সুবর্ণভূমি। এই সব জায়গায় ভারতীয়েরা বাণিজ্য ও বসবাস করতে যেতেন। ঔপনিবেশিকদের চেষ্টায় ক্রমে এখানে

ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ভারতীয় নামধারী রাজাদের অনেক শিলালিপি পাওয়া গেছে। কম্বুজ, চম্পা, মালয় প্রভৃতি হিন্দু-রাজ্যগুলো ছিল প্রধান।

কম্বুজ: কম্বুজে অর্থাৎ বর্তমান কাম্বোডিয়ায় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে একটা হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। চীনারা অঞ্চলটাকে ফুনান বলত। কম্বুজ রাজ্যের হিন্দু রাজারা প্রায় দেড়শ বছর ধরে রাজত্ব করেছেন। প্রাচীন প্রবাদ মতে কৌণ্ডিন্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে এক হাজারেরও বেশী ব্রাহ্মণ এখানে বাস করতেন। কম্বুজের রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইন্দ্রবর্মন, সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন, সূর্যবর্মন প্রভৃতি। এখানে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ে বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পড়ান হত। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই ছিল শৈব। তবে কেউ কেউ বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীও ছিল। অনেক রাজা সংস্কৃত ভাষায় শিলা-লিপি খোদাই করেছিলেন। কেউ বিষ্ণু, কেউ শিবের মন্দিরও তৈরি করেছিলেন। এইভাবে এই সব দেশে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার নতুন বিকাশ হয়েছিল।

যশোধরপুর: যশোধরপুর ছিল কম্বুজের রাজধানী। রাজা যশোবর্মনের সময় এখানে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই নগরের বর্তমান নাম আঙ্কোরথোম। যশোধরপুর নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বহু মন্দির এই নগরকে সুন্দর করেছিল।

কম্বুজের আর এক বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির। প্রথমে এখানে শিবের পূজো হত, পরে বিষ্ণুর পূজো হয়। রাজা সূর্যবর্মনের রাজত্বকালে (১১১২—১১৬২ খৃস্টাব্দ) মন্দিরটা তৈরি হয়। "ভাট্" কথার অর্থ মন্দির। রাজধানী আঙ্কোর থোমের একটু দূরেই ছিল এই মন্দিরটা। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত পাথরের যত মন্দির তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এই মন্দিরটাই সবচেয়ে বড়। এর পাঁচটা চূড়ার মধ্যে দুটো চূড়া শেষ হয়নি, কিন্তু তবুও মন্দিরটা দেখলে

আশ্চর্য হতে হয়। মন্দিরের গায়ে কোথাও রামায়ণ, কোথাও মহাভারত, কোথাও আবার পুরাণের গল্প খোদাই করা হয়েছে।
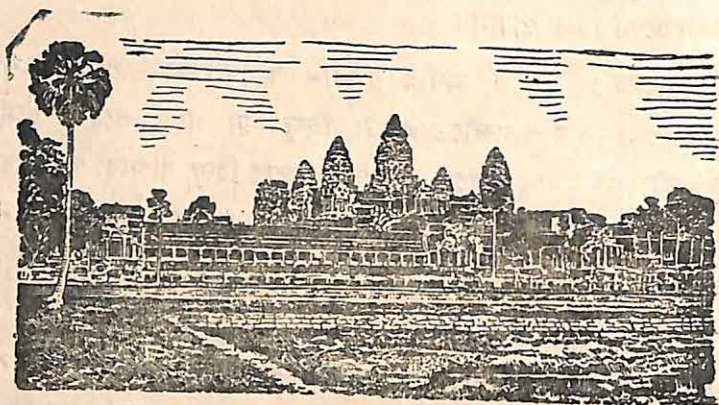
আঙ্কোরভাটের মন্দির

চম্পা : ইন্দোচীনের আর একটি বড় রাজ্য ছিল চম্পা। এই রাজ্যটি ছিল কম্বুজের পূর্ব দিকে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে চম্পা নাম লোপ পেয়েছে। বর্তমান কোচিন-চীন ও আনাম প্রদেশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত ছিল।

চম্পার রাজাদের মধ্যে ভদ্রবর্মন, ইন্দ্রবর্মন, ঈশ্বর মূর্তি, হরিবর্মন প্রভৃতি বড় বড় রাজা ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় ভারতীয় সভ্যতা চম্পায় প্রসার লাভ করেছিল।

চম্পার উপকূলে কোঠার বোধ হয় হিন্দুদের প্রথম উপনিবেশ। চম্পার সবচেয়ে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলো কোঠার থেকেই পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশী শিলালিপি পাওয়া গেছে কোঠারের রাজধানী পো-নগরে।

চতুর্থ পাঠ | মালয় অঞ্চল

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি-দ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি জায়গা নিয়ে এক বিরাট হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে।

এই রাজ্য **শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য** নামে পরিচিত। চীনারা এই সাম্রাজ্যকে **সান-ফো-সি** বলত। এই সাম্রাজ্যের ধনদৌলত ও রাজাদের কীর্তিকলাপের কথা আরব বণিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। শ্রীবিজয় ছিল এই রাজ্যের রাজধানী।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। সে সময় বাংলাদেশ মহাযান বৌদ্ধ মতের কেন্দ্র ছিল। ৭৮২ খৃস্টাব্দে কুমার ঘোষ নামে এক বাঙালী মহাযান বৌদ্ধপন্থী শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্ম-গুরু ছিলেন। যবদ্বীপের দেশীয় ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত এই সময় অনুবাদ করা হয়।

বরবুদুর : শৈলেন্দ্র রাজাদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ। যবদ্বীপের একটা ছোট পাহাড়ের উপর এই স্তূপ। ৪০০ ফুট লম্বা ও ৪০০ ফুট চওড়া। এর ভিত্তিমূল থাকে থাকে ওপরে উঠেছে। মাঝখানের স্তূপটা পর পর নয়টা থাকে গঠিত। নীচের ছটা থাক বর্গাকার, ওপরের তিনটে গোলাকার। ওপরে ওঠার জন্যে চারপাশ দিয়ে সিঁড়ি ছিল। উঁচু থাকে মুকুটের মত একটা
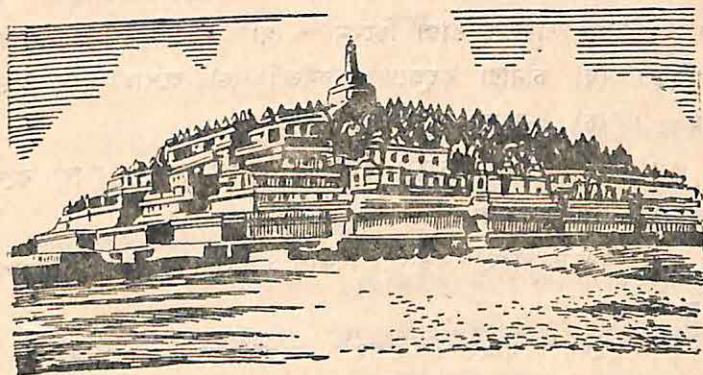
বরবুদুরের স্তূপ

স্তূপ রয়েছে। মাঝের স্তূপটাকে গোল করে ঘিরে রেখেছে ৭২ টা স্তূপ। জাতক ও রামায়ণের গল্পগুলো মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে। মন্দিরের চারপাশে অনেক ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিও খোদাই

করা রয়েছে। কার্নিশ ও সিঁড়ির ধারে ধারে অনেক ছবি আঁকা আছে। অধিকাংশই বুদ্ধের জীবনী নিয়ে আঁকা।

অনুশীলনী

১। ভ্রম সংশোধন কর :—

(ক) মৌর্য সম্রাট অশোক পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, মিশর, ব্রহ্মদেশ, সিংহলে বাণিজ্য করতে দূত পাঠিয়েছিলেন। (খ) চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চলত স্থলপথে ও পারস্য উপসাগর দিয়ে। (গ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্য-এশিয়ার বালির স্তূপ খুঁড়ে অনেক ভারতীয় নিদর্শন পেয়েছিলেন। (ঘ) হর্ষচরিত বইতে চীনপট্টের কথা পাওয়া যায়। (ঙ) কমলশীল চীনে গিয়েছিলেন। (চ) যশোধরপুর ছিল সুমাত্রার রাজধানী।

২। বামপার্শ্ব		ডানপার্শ্ব
(ক) স্যার অরেলস্টাইন	( )	(১) তিব্বত।
(খ) কাশ্যপ মাতঙ্গ	( )	(২) সহস্র বুদ্ধ গুহা।
(গ) তুন-হুয়াঙ	( )	(৩) মধ্য এশিয়া।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ধর্মরত্ন ও — নেতৃত্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। (খ) খোটানের ভারতীয় রাজা ছিলেন — (গ) সহস্র বুদ্ধগুহা — পাহাড়ে অবস্থিত। (ঘ) চীনারা কম্বুজকে — বলত। (ঙ) যশোধরপুরের বর্তমান নাম —। (চ) বেয়নের মন্দিরটি — মন্দির।

৪। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন কে আবিষ্কার করেন? সেখানকার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা দাও।

৫। তিব্বতে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ও অতীশ দীপঙ্করের কার্যকলাপের বর্ণনা দাও।

৬। সুবর্ণভূমি বলতে কি বোঝ? যশোধরপুরের রাজধানীর নাম কি ছিল? যশোধরপুরের বর্ণনা দাও।

৭। চম্পার প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ দাও।

৮। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের ও সভ্যতার বর্ণনা কর।

৯। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ :—

(ক) বেয়নের মন্দির (খ) আঙ্কোরভাট (গ) বরবুদুরের স্তূপ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রথম পাঠ | ভারতে সুলতানী যুগ

বিভিন্ন সুলতানী বংশ :—তুর্ক আফগানেরা ভারতে আসার আগে এদেশে মুসলমান আক্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। আরবেরা দেশ জয়ে বের হয়ে ৭১২ খৃস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করেছিল। কিন্তু প্রতিহার রাজাদের প্রতিরোধের জন্যে তিনশ বছর পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। তারপর গজনীর সুলতান মামুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করে কেবল লুঠ করেন। ১০৩০ খৃস্টাব্দে মামুদ মারা গেলে ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা মহম্মদ ঘুরী শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি ১১৭৫ খৃস্টাব্দ থেকে ভারত আক্রমণ করলেও ১১৯২ খৃস্টাব্দের আগে সফল হননি। ১১৯২ খৃস্টাব্দে **তরাইনের** দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে মহম্মদ ঘুরী তাঁর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিনকে ভারতের শাসনকর্তা করে যান। ১২০৬ খৃস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীকে কেউ হত্যা করলে কুতুবউদ্দিন দিল্লীর সুলতান হন। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

দাস বংশ :—কুতুবউদ্দিন ছিলেন ক্রীতদাস। এইজন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাসবংশ বলা হয়। কুতুবউদ্দিন মীরাট, আজমীড়, রন্থোম্ভর, কনৌজ, আলিগড় প্রভৃতি জয় করেছিলেন। তিনি উদার ও দাতা ছিলেন। তিনি কুতুবমিনারের কাজ আরম্ভ করেন। আর এক বড় সুলতান ইলতুৎমিস ছিলেন কুতুবউদ্দিনের দাস ও জামাতা। তিনি পাঞ্জাব, গোয়ালিয়র, বাংলা রন্থোম্ভর জয় করে-ছিলেন। বাগ্‌দাদের খলিফা তাঁকে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে মঙ্গোলবীর চেঙ্গিস খাঁ খিবার সুলতান জালালউদ্দিনকে তাড়া করে ভারতে আসেন। ইলতুৎমিস জালাল-উদ্দিনকে আশ্রয় না দেওয়াতে চেঙ্গিস ভারত আক্রমণ না করে

চলে যান। ইলতুৎমিস এই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন। তিনি কুতুবমিনারের কাজ শেষ করেন।

ইলতুৎমিসের কিছু পরে রাজিয়া সুলতানা হন। ইনি ভারতের প্রথম ও শেষ মহিলা শাসক। ইনি খুব বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। কিন্তু আমীর ওমরাহেরা স্ত্রীলোকের শাসন পছন্দ করত না—ফলে তারা বিদ্রোহ করে রাজিয়া ও তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলে। **নাসিরউদ্দিন মামুদ** নামে এক ধার্মিক সুলতান এর পর কিছু দিন রাজত্ব করেন। তাঁরপর **গিয়াসউদ্দিন বলবন** সুলতান হয়েছিলেন। তিনি দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। গুপ্তচর রেখে দেশের সব খবর নিতেন। মঙ্গোলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে স্থায়ী সৈন্য-বাহিনী গঠন করেছিলেন। রাজপুতানার মেওয়াটি দস্যুদের এবং বাংলার শাসক তুঘ্রীল খাঁর বিদ্রোহও দমন করেছিলেন। তাঁর সভায় অনেক জ্ঞানী-গুণী লোক ছিলেন। আমীর খসরু তাঁদের মধ্যে প্রধান। ১২৮৭ খৃস্টাব্দে সুলতান মারা গেলে তিন বছরের মধ্যে এই বংশের পতন হয়।

খলজি বংশঃ ১২৯০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৩২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খলজি বংশ রাজত্ব করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **আলাউদ্দিন**। তাঁর সময়ে পাঁচবার মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করে। পাঁচবারই মোঙ্গলরা পরাজিত হয়। ১২৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি গুজরাটের রাজা কর্ণদেবকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। এরপর তিনি রাজপুতনার রাজ্যগুলোকে জয় করেন। তাঁর সবচেয়েবিখ্যাত অভিযান মেবারের রাণা রতনসিংহের বিরুদ্ধে। এর উদ্দেশ্য ছিল চিতোর জয় করে চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে লাভ করা।

আলাউদ্দিন

চিতোর অনেক কষ্টে জয় করলেও পদ্মিনীকে পাননি। পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন। এরপর তিনি মালিক কাফুরের
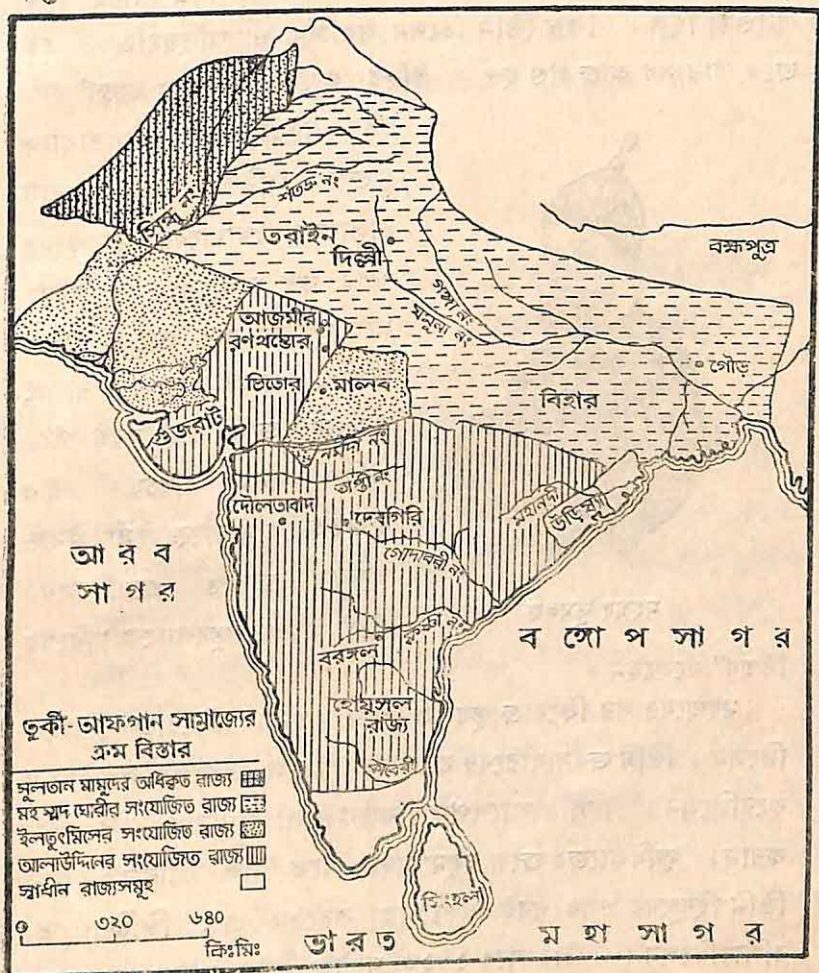
নেতৃত্বে একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল, পাণ্ড্যরাজ্য, মাদুরা, দোর সমুদ্রের রাজাদের পরাজিত করেন। কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে সেখানে একটা মসজিদ তৈরি করেন। এইভাবে আলাউদ্দীন প্রায় সমস্ত ভারত জয় করেছিলেন।

তুঘলক বংশ : তুঘলক বংশ ১৩২০ থেকে ১৪১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **মহম্মদ তুঘলক**। মহম্মদ বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী সুলতান ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু ও অস্থিরমতি। এই জন্যে তাঁর সব কাজ পণ্ড হত। ইতিহাসে তাঁকে 'পাগলা রাজা' বলা হয়। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তন, তামার নোট চালানো, দোয়াবের কৃষকদের ওপর কর চাপানো, মঙ্গোলদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাদের টাকা দেওয়া, খোরাসান, ইরাক, কারাজল জয়ের ইচ্ছা সবই তাঁর অস্থির মনের পরিচয়। তাঁর রাজত্বকালে মরোক্কোবাসী ইবন-বতুতা ভারতে এসেছিলেন। তিনি মহম্মদ তুঘলককে "বিশ্বের বিস্ময়" বলেছেন।

মহম্মদ তুঘলক

মহম্মদের পর ফিরোজ তুঘলক সুলতান হন। ফিরোজ সুশাসক ছিলেন। তিনি জনসাধারণের জন্যে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, সরাইখানা করেছিলেন। দিল্লীর আশেপাশে কতকগুলো বাগান ও নগর তৈরী করান। কৃষিকাজের জন্যে যমুনা নদী থেকে খাল কাটান। তবে তিনি হিন্দুদের ওপর খুবই অত্যাচার করতেন এবং জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন। তাঁর পরে ১৪১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মামুদ শাহ রাজত্ব করেছিলেন। মামুদ শাহের সময় তৈমুর লঙ ১৩৯৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করে লুঠ করেন। মামুদ শাহ মারা গেলে ১৪৫১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে সৈয়দ বংশ রাজত্ব করে।

লোদী বংশ : সৈয়দ বংশের পর ১৪৫১ থেকে ১৫২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লোদীবংশের তিনজন সুলতান পর পর রাজত্ব করেন। এই

বংশের শেষ সুলতান ছিলেন **ইব্রাহিম লোদী**। তিনি খুবই অহংকারী ও ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। এইজন্যে কেউ তাঁকে পছন্দ করত না। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের রাজা বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে ডাকেন। বাবর ১৫২৬ খৃস্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিমকে হারিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ | (ক) সুলতানী যুগে দেশের অবস্থা

মুসলমানেরা বিদেশ থেকে এসে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেছিল। এদের সভ্যতাও ছিল উন্নত। ভারতীয়দের সঙ্গে কোন বিষয়েই এদের মিল ছিল না। এমন কি প্রথম দিকে মুসলমান ও ভারতীয়দের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল না। কিন্তু এক সঙ্গে পাশাপাশি অনেকদিন থাকার ফলে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের জন্যে ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যে নতুন ধারা দেখা গিয়েছিল।

সমাজঃ হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা খুবই কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে সমাজ চলত। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের উপর খুবই অত্যাচার করত। তাদের ধর্মশাস্ত্র পড়া দেবদেবীর মন্দিরে যাওয়া নিষেধ ছিল। এইজন্যে অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বহু বিবাহ, পণপ্রথা ও সতীদাহ প্রথা ব্যাপক আকারে চালু ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ খেত। তবে অন্যদের খাওয়া দাওয়ার কোন বাধা নিষেধ ছিল না। হিন্দু সমাজে মুসলমান সমাজের মত পর্দা প্রথা চালু হয়। মেয়েরা পুরুষের অধীন ছিল।

হিন্দুযুগে সমাজে মেয়েদের যে উঁচু স্থান ছিল এই সময়ে তা ছিল না। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সমাজকে ছেয়ে ফেলেছিল।

অন্যদিকে মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল না কিন্তু "শিয়া" ও "সুন্নী" এই দুই সম্প্রদায় ছিল। ওদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হত। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পর্দাপ্রথা প্রভৃতির জন্যে মুসলমান সমাজেও মেয়েদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। মুসলমান সমাজেও নানা কুসংস্কার ছিল এবং মদ্যপান ব্যাপকভাবে চলত।

অর্থনীতি : এই যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল মানুষের জীবিকা। কৃষিদ্রব্যের দাম খুবই কম ছিল। দেশে প্রচুর কৃষি-জাত দ্রব্য হওয়ার ফলে বিদেশে রপ্তানী হত। দক্ষিণ ভারত ছিল এশিয়ার প্রধান বাজার। সুলতানদের উৎসাহে রেশম বস্ত্র ও জরি প্রভৃতির কাজ ব্যাপকভাবে হত। পশমের কাপড়ও তৈরী হত। এই কাপড় শিল্পে বাঙলা ও গুজরাট বিখ্যাত ছিল। চিনি শিল্পে ও চর্মশিল্পে অনেক লোক কাজ করত। ইউরোপ, চীন, মালয় উপদ্বীপ, আফগানিস্থান, পারস্য, তিব্বত, ভূটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। ভারত থেকে কৃষিজাত দ্রব্য, নীল, কাপড় ও আফিঙ প্রভৃতি রপ্তানি এবং ঘোড়া ও বিলাস-দ্রব্য আমদানী করা হত। ব্যবসার সূত্রে ভারতে প্রচুর সোনা আসত। দেশে প্রচুর সম্পদ থাকলেও সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের অবস্থা ভালো ছিল।

ভক্তিবাদ : ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হিন্দু-ধর্মের নিয়ম খুবই কঠোর হয়ে যায়। ইসলামের প্রভাব থেকে হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যে সমাজের রীতিনীতিকে কঠোর করতে হয়। ফলে অনেক হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের বিরোধ বেধে যায়। ফলে হিন্দু-ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে ভক্তিবাদ বা উদার ধর্মমতের জন্ম হয়। হিন্দুদের যেমন ভক্তিবাদের প্রভাব পড়ে, তেমনি মুসলমান সমাজেও

সুফী মতবাদের প্রভাব পড়ে। সুফী মতবাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিল আছে। সুফীদের নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও খাজা মুইনউদ্দীন চিশতি এবং ভক্তিবাদীদের মধ্যে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ।

ভক্তিবাদের মূল কথা হল মনের পবিত্রতা, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস, সৎকর্ম, ও সদাচার।

কবীর ঃ ভক্তিবাদীদের মধ্যে কবীর বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিরু নামে এক তাঁতী ছোটবেলায় তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। কবীর ছোটবেলা থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। কবীরের বংশ পরিচয় ঠিক না থাকায় প্রথমে কেউ তাঁকে শিষ্য করতে চান নি। পরে ব্রাহ্মণ সাধক রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করে নেন। কবীর বলতেন, যে ধর্মে ভক্তির স্থান নেই সে ধর্ম কখনও ধর্ম হতে পারে না। তিনি বলতেন হিন্দুরা মরে 'রাম রাম' করে, মুসলমানেরা মরে 'খোদা খোদা' করে। 'রাম' এবং 'আল্লাহ্' এক এবং অভিন্ন, এই কথা তিনি বুঝেছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে যা সারবস্তু তাই তিনি প্রচার করতেন।

কবীর

নানক ঃ শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক ১৪৬৯ খৃস্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে জন্মেছিলেন। বংশের ধারা অনুসারে প্রথমে তিনি ব্যবসা করতেন। কিন্তু এসব তাঁর ভালো লাগে না। তিনি সংসার ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়ান। মক্কাতেও তীর্থ করতে তিনি গিয়েছিলেন। তিনি শিখ ধর্মের প্রবর্তক হলেও একটা নির্দিষ্ট

নানক

ধর্ম নিয়ে তিনি থাকতেন না। সকল মানুষই তাঁর কাছে সমান ছিলেন। সেইজন্যে তিনি বলতেন, হিন্দু বলতেও কেউ নেই—মুসলমান বলতেও কেউ নেই। রাম ও রহিম এক ও অভিন্ন—এটাই পরম সত্য। প্রেম ও মৈত্রী সবার উপরে। মানুষের একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর। জাতিভেদ মিথ্যা। "নাম" বা ঈশ্বরের গুণগান, "দান" বা জীবের সেবা এবং "স্নান" বা দেহের বিশুদ্ধি—এই তিন বৃত্তির অনুশীলন করলে মানুষের উন্নতি হয়—নানক তাই মনে করতেন। তিনি বলতেন, সকল মানুষকে যে সমান চোখে দেখে সেই প্রকৃত ধার্মিক। ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

শ্রীচৈতন্য: ১৪৮৫ খৃস্টাব্দে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর। তিনি নিমাই ও গৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিলেন। একবার তিনি গয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি মন্ত্র নেন। নবদ্বীপে ফিরে এলে অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি নবদ্বীপের পথে পথে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে বেড়ান। তাঁর ভক্তের সংখ্যা দিনদিন বাড়তে থাকে। সব জাতের এবং শ্রেণীর লোক তাঁর ভক্ত হয়।

শ্রীচৈতন্য

১৫০৯ খৃস্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসী হন। কাটোয়ার কেশব ভারতী তাঁকে দীক্ষা দেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দিয়েছিলেন। বাংলার সে সময়ের সুলতান হুসেন শাহও তাঁর ভক্ত ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে উড়িষ্যার নীলাচলে দেহ রাখেন।

দ্বিতীয় পাঠ

(খ) সুলতানী যুগে বাংলার অবস্থা

সমাজ ও ধর্ম : বাংলা দেশের সুলতানেরা দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করলেও প্রায় ২০০ বছরের বেশী সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। মুসলমান রাজাদের অধীনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানেরা এই দেশকে নিজেদের দেশ মনে করত। উভয় জাতের মধ্যে ঐক্যভাব গড়ে উঠেছিল। পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও স্থাপিত হয়েছিল। ফলে বাঙালীর সমাজ ও ধর্মজীবনের পরিবর্তন হয়। হিন্দুরা অনেক মুসলমান আদব-কায়দা শিখল, আরবী, ফার্সী পড়ে কর্মচারীও হল। মুসলমানেরাও হিন্দুদের কিছু চাল-চলন শিখল। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়াদাওয়ার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথম দিকে ধর্মান্ধ রাজকর্মচারী ও ধর্মপ্রচারকদের জন্যে হিন্দুদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আলাউদ্দিন ইলিয়াস সাহের সময় পরধর্মসহিষ্ণুতা নীতির ফলে হিন্দুরা বাঁচে। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ ও মুসলমানদের পীর মিশে হয় "সত্যপীর" হিন্দু মুসলমান দু জাতই সত্যপীরকে সিন্নী চড়ায়। এই সময় চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে।

অর্থনীতি : গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাঙালীরা তখন থাকত। চাষ-আবাদ ব্যবসা-বাণিজ্য করে লোকেরা জীবন যাপন করত। সম্পন্ন লোকেরা লেখাপড়া শিখে রাজ কাজের চেষ্টা করত। খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যেত। দরও ছিল সস্তা। ইবনবতুতা বলেছেন বাংলায় যত সস্তায় জিনিষ পাওয়া যেত অন্য কোথাও সেরকম দেখা যেত না। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, চালের দাম দু আনা, ঘিয়ের দাম দেড় টাকা, এক পয়সায় একটা মুরগী এবং তিন টাকায় একটা গরু কেনা যেত। বিদেশে ঢাকাই মসলিনের খুব আদর ছিল। বাঙালীরা বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। তবে দেশের সাধারণ

মানুষের অবস্থা ভালো ছিল না। জিনিষপত্র সস্তা হলেও দেশে টাকার অভাব ছিল। দুর্ভিক্ষ হলে জিনিষের দাম বেড়ে যেত, গরীবদের দুর্দশাও বাড়ত।

সাহিত্য ঃ স্বাধীন সুলতানদের সময় বাঙলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় যুগ। এই সময় কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা করেন। মনসামঙ্গল রচনা করেন বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই। শঙ্করকিঙ্কর গুপ্ত 'গৌরীমঙ্গল' নামে একটা মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। পদাবলী সাহিত্যে দৈবকী নন্দন সিংহ খ্যাতি লাভ করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও রামচন্দ্র খান মহাভারতের অনুবাদ করেন। মৃগাবতী কাব্য লেখেন শেষ কুতবন্। বিখ্যাত কবি মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য ও গীতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। রূপ ও সনাতন ছিলেন এযুগের দুজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শিল্প ও স্থাপত্য ঃ—বাংলার হুসেনশাহী ও ইলিয়াসশাহী সুলতানদের আমলে শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হোসেন-শাহী রাজত্বকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ তৈরী হয়। এগুলোর মধ্যে ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ কদমরসুল প্রসিদ্ধ। ইলিয়াসশাহী রাজত্বকালে পাণ্ডুয়াতে আদিনা মসজিদ তৈরি হয়। এটি পৃথিবীর একটা বৃহত্তম মসজিদ। এ ছাড়াও অনেক সুন্দর সুন্দর সমাধি-ভবনও তৈরী হয়েছিল। এগুলোর সবই বাংলার নিজস্ব শিল্পও স্থাপত্যরীতির পরিচয় দেয়।

তৃতীয় পাঠ | সুলতানী যুগে শাসন ব্যবস্থা

মুসলমানদের সময়ে শাসন-ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। সুলতান ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে। তিনি ছিলেন একদিকে সর্বোচ্চ

শাসক প্রধান সেনাপতি এবং বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত। বিভিন্ন শাসন বিভাগ পরিচালনার জন্যে তিনি কর্মচারী রাখতেন।

বিচার-ব্যবস্থার প্রধান কর্তৃত্ব ছিল প্রধান কাজীর হাতে। ইসলাম ধর্মের আইন অনুসারে বিচার করা হত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালদের ওপর। এই সময় ব্যাপক আকারে গুপ্তচর প্রথা চালু ছিল।

সুলতানী আমলে বিভিন্ন ধরনের কর ছিল। যেমন—বসতবাটীর কর, জলকর, ধর্মীয় কর, জিজিয়া কর ইত্যাদি। এসব ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর কর নেওয়া হত।

সুলতানী যুগে শাসন ব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করত। প্রাদেশিক শাসন কর্তারা প্রদেশ শাসন করতেন, প্রদেশগুলোকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করা হয় এবং সেখানকার শাসনকর্তাকে আমীর বা মক্‌ত বলা হত। এঁদের নীচে নানা শ্রেণীর কর্মচারী থাকতেন।

অনুশীলনী

১। **দু এক কথায় উত্তর দাও :—**

(ক) ১১৯২ খৃস্টাব্দ কি কারণে বিখ্যাত? (খ) তুঘ্রিল খাঁ কে ছিলেন? (গ) আলাউদ্দিনের সময় মঙ্গলেরা কবার ভারত আক্রমণ করে? (ঘ) ইতিহাসে "পাগলারাজা" কাকে বলা হয়? (ঙ) ইবন্ বতুতা কে ছিলেন?

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) কুতুবউদ্দিন ছিলেন —। (খ) চিতোরের — ছিলেন —। (গ) ভক্তিবাদীদের মূলকথা হল মনের – ঈশ্বরে ভক্তি ও — সৎকর্ম ও —। (ঘ) "নাম" কথার অর্থ — গুণগান। (ঙ) — ও — এক ও অভিন্ন।

৩। দাসবংশের তিনজন সুলতানের নাম কর। তাঁদের মধ্যে যে কোনও একজনের বিষয় আলোচনা কর।

৪। সুলতানী যুগের সমাজ ও অর্থনীতির বিষয় কি জান বল।

৫। সুলতানী যুগের শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

৬। আলাউদ্দিন খল্‌জির বিষয় বর্ণনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন ও মধ্যযুগের অবসান

তুর্কীদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল অটোম্যান্‌রা। চেঙ্গিস্‌ খাঁ যখন পশ্চিম-তুর্কীস্থানে আক্রমণ করেন, তখন মঙ্গোলদের অত্যাচারে সেখানকার কয়েক হাজার লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়। ইতিহাসে এরাই অটোম্যান্‌ তুর্কী বলে পরিচিত। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এরা তুরস্কে এসে পৌঁছান। সেখানে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। অটোম্যান্‌রা যুদ্ধে যে পক্ষ হারছিল তাদের দিকে যোগ দিল। যাদের পক্ষে অটোম্যান্‌রা যোগ দিয়েছিল তারা ছিল সেলজুক তুর্কী। এই সেলজুক তুর্কীদের শক্তি কমে গেলে অটোম্যান্‌রা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ১৩৫৩ খৃস্টাব্দে তারা ইউরোপে ঢুকে পড়ে। কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের দু ধারে তারা এশিয়া ও ইউরোপে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তখন রোম সাম্রাজ্য কেবল কনস্ট্যান্টিনোপলেই সীমাবদ্ধ রইল। অবশেষে ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে অটোম্যান্‌দের সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বকালে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল্‌ তুর্কীদের অধিকারে আসে। এই সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের শেষ ও বর্তমান যুগের সূচনা হয়।

অটোম্যান্‌দের সাফল্যের বিশেষ কারণ ছিল। সুলতানেরা ছিলেন সাহসী এবং দক্ষ, আর তাঁদের সৈন্যেরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সুলতান ওসমানের এক ভাই বন্দী খৃস্টানদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এরা ভালো যুদ্ধ করতে পারত। সেইজন্যে তাঁরা খৃস্টান যুবকদের ধরে এনে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি করে নিতেন। এরা এক শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হল। এই সৈন্যবাহিনীর নাম ছিল জেনীসারিস্‌ বা "নতুন সৈন্যবাহিনী"। এদের জোরেই অটোম্যানেরা যুদ্ধে অপরাজেয় ছিল।

নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য : কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের দিনটা

(১৪৫৩ খৃস্টাব্দ) ইতিহাসে স্মরণীয় এই ঘটনা থেকে এক যুগের অবসান ও নতুন যুগের শুরু হল। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল। প্রায় এক হাজার বছরের তথাকথিত অন্ধকার যুগের শেষ ও নতুন যুগের আরম্ভ হল। যেন বহুদিনের ঘুমের ঘোর কাটিয়ে মানুষ জেগে উঠল। একেই বলা হয় "রেনেসাঁস বা নবজাগরণ।" এর গোড়ার দিকে সাহিত্য ও শিল্পের নবজন্ম হল। বহু শতাব্দীর পর্দা ভেদ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই প্রাচীন গ্রীসের উজ্জ্বল দিনগুলোর ওপরে। অবশ্য এই সবই সহসা কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে হয় নি। তুর্কীরা শহরটা জয় করার পর সমস্ত পরিবর্তনটা তাড়াতাড়ি হয়েছিল, কারণ বহু সংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোক শহর ছেড়ে পশ্চিমে চলে যান। এঁরা ইতালিতে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন গ্রীক সাহিত্য-ভাণ্ডারের সেরা জিনিষগুলো। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও চিন্তাধারা ইতালি বা মধ্যযুগীয় পশ্চিমের কাছে কিছু নতুন জিনিষ ছিল না। তবু নতুন করে গ্রীক সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে মানুষের মনে প্রচলিত জীবন-যাত্রার প্রতি সংশয় জাগল, নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্র তৈরী হতে লাগল। এত দিনের জানা জিনিষ নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। আরও বেশি জানবার জন্যে তারা নতুনের খোঁজে মন দিল। মানুষের গোঁড়ামি কেটে যেতে লাগত। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার মানুষের চিন্তা ও ভাবনাকে প্রভাবিত করল। তারা চার্চ ও ধর্মের অনুশাসন মানতে চাইল না। প্রাচ্য দেশে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটল। পরবর্তী যুগে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও অর্থাগম ইউরোপের অন্যান্য জাতির বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। সবাই নতুন দেশ আবিষ্কার ও উপ-নিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় মেতে উঠল।

নতুন চিন্তা, নতুন যুক্তি মানুষের মনে নতুন ভাবের সৃষ্টি করল। এতদিনের অত্যাচারের এবং অন্য দেশের অধীনতা থেকে দেশের জনসাধারণ মুক্তি পেতে চাইল।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে জনসাধারণের বিরোধ দেখা দিল। ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে "শতবর্ষ যুদ্ধ" নামে যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধের শেষ হতেই ইংলণ্ডে গোলাপের যুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে সামন্ত প্রথা লোপ পায় এবং শক্ত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অপর দিকে তিন শতাব্দী ধরে জাতীয় সংহতি গড়ার চেষ্টা চলেছিল। স্পেন, পর্ত্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ড ছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের একটি অংশ। এই অঞ্চলটি অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীন ছিল। ১৪৯৯ খৃস্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। দেখা যাচ্ছে এই সময় রেঁনেসাস বা নবজাগরণের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং জাতীয়তা বোধের চেতনা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই সবের ফলে সব কিছুই নতুন আকার ধারণ করল। মানুষ এক নতুন জীবনের আস্বাদের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।

অনুশীলনী

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—**

(ক) অটোম্যান কারা? (খ) জেনীসারিস্ কাদের বলা হয়? (গ) ১৪৫৩ খৃস্টাব্দের গুরুত্ব কি? (ঘ) রেনেসাঁস কাকে বলে?

২। কত খৃস্টাব্দে কন্স্ট্যান্টিনোপলের পতন হয়? কন্স্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে কি হয় তাহার বর্ণনা কর।

———